পল্লবী

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
২৩ জানুআরি ১৯৬৪

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা — ৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা — ৪

প্রচ্ছদ
দেবাশীষ রায়

পল্লবী

দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার স্বপ্ন কিসের?

পল্লবীর জীবন শুরু হয়েছিল হাসি আর আদরের মধ্য দিয়ে। বাবার নাম —অনাময় মিত্র ; মা সান্ত্বনা দেবী। তিন ভাই-এর পর এক বোন—পল্লবী, স্বভাবতই বাড়িতে খুশির হাওয়া। তিন ভাই—অজেশ, অশেষ ও বিশেষ, ওদের ভালোবাসা, বাবা-মার স্নেহ সবটাই পল্লবীর জন্য। পল্লবীদের সংসার এক কথায় সুখী, সচ্ছল। অনেক জমি-জায়গা, বিরাট দালানবাড়ি, বাগান, পুকুর, জমিদারবাড়ির মতোই বাড়িতে অনেক লোকের আনাগোনা। সুখে, শান্তিতেই কাটছিল পল্লবীদের সর্ব অর্থে ভরা সুখের সংসার। সেখানে লেগেই ছিল 'বার মাসে তেরো পার্বণ', তার পাশাপাশি আত্মীয়স্বজনদের প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটাও ছিল। বাড়ির প্রত্যেকেই ছিলেন উদার মনের, কোনো সংঘাত বা সঙ্কীর্ণতা কখনও কারও মনে দানা বেঁধে ওঠেনি। ভালোভাবেই চলে যাচ্ছিল পল্লবীদের সুখের সংসার।

একমাত্র মেয়ে অনাময়বাবুর, আদর করে নাম দিয়েছিলেন পল্লবী, বাড়িতে সবাই ডাকতেন 'স্নেহা' বলে ; যেন স্নেহ নিয়েই সে জন্মগ্রহণ করেছিল সবাইকে, স্নেহ-ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে বলে। স্নেহার হাতেখড়ি—ধুমধাম করে বাড়িতে উৎসব হলো, ঘটা করে বাড়িতে সরস্বতী পুজো হলো, প্রচুর লোক, খাওয়া-দাওয়া, একেবারে এলাহি ব্যাপার। এরপর মেয়ের স্কুলে যাওয়ার পালা। তিন দাদা অজেশ, অশেষ, বিশেষ তো ইতিমধ্যেই স্কুলে পড়াশুনা করে। ছেলেদের জন্য রয়েছেন গৃহশিক্ষক ; এবার স্নেহার জন্য বাড়িতে জোগাড় করা হলো একজন 'দিদিমণি'। সান্ত্বনা দেবীর ভীষণ ইচ্ছে

ছিল মেয়ে গান শিখুক তাই স্নেহার জন্য বাড়িতে রাখা হল একজন গানের শিক্ষকও। পড়াশুনার পাশাপাশি চলতে লাগল গান শেখার তালিম। মা সান্ত্বনা দেবী রোজই বসে থাকেন আশায়—স্নেহা কবে হারমোনিয়াম বাজিয়ে সম্পূর্ণ গান গাইবে। 'সা-রে-গা-মা'র তালিম তো চলছিলই ; এরপর রবীন্দ্রনাথের গান—'আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা'। একদিন সত্যি সত্যিই স্নেহা গানটি সম্পূর্ণ তুলে ফেলল হারমোনিয়ামে, সান্ত্বনা দেবী তখন আনন্দে আত্মহারা। একমাত্র মেয়ে স্নেহা গান তুলেছে হারমোনিয়ামে, সবাইকে জানাতে হবে তো! সান্ত্বনাদেবী অনুরোধ করলেন স্বামীকে দালানে একটা গানের আসর বসানোর জন্য। বাইরে থেকেও দুচারজনকে ডেকে গান গাওয়ান হবে, তাদের সঙ্গে গান গাইবে স্নেহা। অনাময়বাবু সবশুনে বললেন, 'আর কিছুদিন যাক, স্নেহা ভালো করে গান শিখুক, তার পরে না হয় করা যাবে গানের অনুষ্ঠান।' কিন্তু সান্ত্বনা দেবীর হৃদয়ের আবেগ কোনো বাধাই মানতে রাজি নয়, তাই যথারীতি গানের আসর বসল মিত্র পরিবারের দালান-কোঠায়। স্নেহার আদুরে গলায় 'আলো আমার আলো...' যেন সবাইকে ক্ষণিকের জন্য আলোড়িত করে গেল। সান্ত্বনা দেবীর চোখে তখন আনন্দাশ্রু, মেয়ে একদিন গান গেয়ে নিশ্চয়ই খুব নাম করবে এই আশায়, স্বপ্নে তিনি তখন বিভোর।

এইভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। হঠাৎ করেই একদিন শুরু হয়ে গেল দেশভাগের চক্রান্ত। শুরু হয়ে গেল অত্যাচারের বিভীষিকা। প্রাণ বাঁচানই তখন এক বিরাট দায় ; মানুষ তখন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে দিশাহারা। ছিন্নমূল মানুষেরা অনেকেই ওপার বাংলা থেকে পা বাড়াতে শুরু করলেন এপার বাংলার দিকে। মিত্র পরিবারেও নেমে এল একটা অজানা আশঙ্কা—এবার কী হবে? সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না—বিপদের ঘূর্ণিঝঞ্ঝার মধ্যে দিন কাটানোর চেয়ে সুখের আরামকেদারা ছেড়ে মানসিক শান্তিতে থাকা অনেক ভালো। যা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল তাই নিয়েই, দিন সাতেকের মধ্যেই মিত্র পরিবার পা বাড়ালেন এপার বাংলার উদ্দেশে।

স্নেহা তখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। তার মনে জিজ্ঞাসা—কেন? কেন সব থাকতেও সব কিছু হারিয়ে চলে যেতে হচ্ছে তাদের? কোথায় পড়ে রইল

তার সাধের খেলার ঘর, দালানবাড়ি, কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে তার অতিপ্রিয় দোলনা। কিছুতেই মানতে পারে না স্নেহা, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে। সান্ত্বনা দেবীর চোখেও তখন জল। মন না-চাইলেও প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে, অঘ্রাণের এক সকালে মিত্র পরিবার পাড়ি দিল এপার বাংলায়, অজানা আশ্রয়ের সন্ধানে। পথে যেতে যেতে শেষবারের মতো একবার ফিরে চাওয়া পিছনের দিকে, আজন্ম পরিচিত ফুলের সৌরভ লেগে আছে চোখে মুখে, গাছগুলো শাখাপ্রশাখা দুলিয়ে বিদায় জানাচ্ছে, রয়ে গেল পোষা পায়রাগুলো, বোধহয় বসতবাড়িটা পাহারা দেওয়ার জন্যই।

ঠিকানা বদল হলো মিত্র পরিবারের। সাময়িক স্থান হলো কলকাতায় এক আত্মীয়র বাড়িতে। সেখান থেকেই মাথা গোঁজার ঠাই আর জীবিকার সন্ধান শুরু হলো। দেখতে দেখতে কলকাতার উপকণ্ঠে পাওয়া গেল বাড়ি। দালান-কোঠায় থাকতে যারা অভ্যস্ত তাদের ভাগ্যে জুটল ছোট্ট দুটো ঘর—প্রায় পায়রার খোপের মতোই। সামান্য সঞ্চিত অর্থে অনাময়বাবু খুললেন একটা মুদি দোকান। শুরু হলো মিত্র পরিবারের নতুন জীবন সংগ্রাম। স্নেহা ভর্তি হলো পঞ্চম শ্রেণীতে। তিন দাদা অজেশ, অশেষ, বিশেষও ভর্তি হয়ে গেল যথাক্রমে দশম, অষ্টম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে। দিন আনা আর দিন খাওয়ার মধ্যেই চলল বেঁচে থাকার এক কঠিন সংগ্রাম।

স্নেহা স্কুলে ভর্তি হলেও, কোনো গৃহশিক্ষক রাখার ক্ষমতা তখন মিত্র পরিবারের নেই। গান শেখাও বন্ধ, হারমোনিয়ামটা রয়ে গেছে ওপার বাংলার ফেলে আসা বাড়িটিতে। নতুন স্কুল, নতুন জায়গা—স্নেহার কোনো বন্ধু নেই। অবসর সময় কাটানোর একমাত্র সম্বল একটা ছোট্ট রেডিও। স্নেহা সেই রেডিওতে কখনও গান, কখনও নাটক আবার কখনও যাত্রা শোনে। স্কুলে যাওয়া আর রেডিও শোনা—এইভাবে সময় কাটে স্নেহার। এইভাবেই কেটে যায় বছরখানেক। স্নেহা ভালো ভাবেই ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। ছেলেদের জন্য গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা হয়। বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত অনাময়বাবু কাঁধে গামছা ফেলে মুদির দোকান চালিয়ে মানসিক এবং শারীরিকভাবে প্রায় বিধ্বস্ত। কিন্তু তাঁকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়তে দেখলে পাছে পরিবারের কারও মন খারাপ হয়, তাই ঘরে ফিরে অনাময়বাবু সবাইকে নিয়ে মেতে উঠতেন হাসিঠাট্টায় ; মাথার ওপর বটবৃক্ষের মতো থেকে বাইরের সমস্ত দুঃখ

কষ্ট থেকে সংসারটাকে আড়াল করে রাখতেন।

এইভাবেই মিত্র পরিবারের সবাই আস্তে আস্তে পুরনো জীবনটাকে ভুলতে শুরু করল। কিন্তু অনাময় মিত্রের মনে তখন এক অজানা আশঙ্কার ঝড়, তিনি শুধু ভাবেন আর কতদিন এভাবে তাঁর পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব হবে? একে তো নিজের সংসারের চিন্তা, অন্যদিকে একটু হাসির মুখ দেখতে না দেখতেই বাড়িতে শুরু হয়েছে আত্মীয়-স্বজনের আনাগোনা-প্রথম একবছর তো আত্মীয়রা খবর নেওয়ার কোনো চেষ্টাই করেনি যে, মিত্র পরিবার কোথায় আছে, কেমন আছে, খেয়ে আছে না, না-খেয়ে আছে। কিন্তু বছর ঘুরতেই হাজির আত্মীয়দের দল। মুখে না বললেও অধৈর্য হয়ে পড়েছিল মিত্র পরিবার ; কারণ আত্মীয়দের যে শুধু থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে তাই নয়, তাদের আবার কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর ব্যবস্থাও করতে হবে। কেউ যেতে চান কালিঘাটে তো কেউ দক্ষিণেশ্বর, কেউ বা ভিক্টোরিয়ায় তো কেউ আবার চিড়িয়াখানায়। এরপরও তাদের আবার নতুন জামাকাপড় কিনে দিতে হবে, নাহলেই মুখ গোমড়া। এ জিনিস এক-আধবার কষ্ট করে মানা যেতে পারে কিন্তু দিনের পর দিন এই আবদার মানা সম্ভব? চাপা অসন্তোষ প্রকাশ পায় মিত্র পরিবারে।

এরমধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন অনাময়বাবু—অত্যধিক পরিশ্রমে জ্বরে বেহুঁশ চারদিন। ফলে দোকান চারদিন বন্ধ, পয়সার অভাব, বাড়ির বাজার হচ্ছে না। এই সংকটের মধ্যেও এসে হাজির এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়—তার মেয়ের বিয়েতে অনাময়বাবুকে আর্থিক সাহায্য করতে হবে। অনাময়বাবুর মাথায় হাত, সান্ত্বনা দেবী বিরক্ত, ছেলেদের রাগ, কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কে বলবে আমাদের আর্থিক ক্ষমতা নেই আপনাকে সাহায্য করার? বাবা-মার অত্যন্ত আদরের স্নেহা বাবার পাশে বসে, বাবার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, বাবা তুমি চিন্তা করো না, আমরা তো সবাই আছি। ছোট্ট স্নেহার মুখে এই কথা শুনে অসুস্থ অবস্থাতেও আবেগে কেঁদে ফেললেন অনাময়বাবু, স্নেহার হাতদুটো ধরে বললেন, মা, তুই আমাকে আলো দেখা, মা। উত্তর এল স্নেহার কাছ থেকে, দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল স্নেহা, বাবা, সবার কাছে আমিই খারাপ হব, অপ্রিয় হতে হয় আমিই হব, ওদের যা বলার আমি বলব, এ নিয়ে তুমি চিন্তা করো না। আর এখন থেকে তোমার কষ্ট একটু হলেও

কমানোর জন্য আমি নিজেও কিছু রোজগার করার চেষ্টা করব যাতে নিজের পড়াশুনার খরচটা নিজেই চালিয়ে নিতে পারি।

সাহায্যপ্রার্থী আত্মীয় তখন পাশের ঘরে বসে আছেন। তার কাছে গিয়ে বিনীতভাবেই স্নেহা বলল, আজ আমার বাবা অসুস্থ, ওষুধ কেনার পয়সা নেই, আপনি কি বাবার জন্য ওষুধগুলো কিনে দেবেন? বাবার কিছু হয়ে গেলে আমরা যে সবাই শেষ হয়ে যাব! আত্মীয় বুঝতে পারলেন সত্যিই বাস্তব পরিস্থিতিটা তাঁর অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল ; একটা ছোট্ট মেয়ের সামান্য কয়েকটা কথা যেন তার বিবেককে কশাঘাত করতে লাগল। তিনি কাছে ডেকে নিলেন স্নেহাকে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে পরম মমতায় বললেন, মা, তুমি বেঁচে থাকো তোমার সাহসিকতা নিয়ে, যে অপ্রিয় কথা তুমি আমাকে শোনালে তা যতই নির্মম হোক—সেই সামান্য ক'টা কথাতেই বাস্তব জগৎটা যেভাবে তুমি আমার সামনে তুলে ধরলে তাতে সত্যিই আমি একই সঙ্গে লজ্জিত এবং আনন্দিত, আমার স্বার্থপর চোখদুটোকে তুমি আজ নতুন করে দৃষ্টিদান করলে মা! ছলছল করে উঠল স্নেহা এবং তার চোখ, মাথা নত করে ফিরে গেলেন তিনি।

ঘটনাটা গিয়ে পৌঁছল অন্যান্য আত্মীয়দের কানেও। ফলে মিত্র পরিবারে আপাতত আত্মীয়-স্বজনের যাওয়া-আসা বন্ধ হলো, যেন ঘাড় থেকে একটা বড় বোঝা নামল। একটু একটু করে সামান্য সুস্থ হতেই ক্লান্ত শরীর নিয়েও অনাময়বাবু আবার বসলেন দোকান খুলে, নাহলে সংসার চলবে কী করে? স্নেহা শুরু করল 'প্রাইভেট টিউশানি', নিজেদের ঘরে চার-পাঁচজন বাচ্চা পড়াতে শুরু করল। নিজের পড়াশুনার খরচ নিজে তো জোগাড় করলই, উপরন্তু দাদাদের পড়াশুনোর খরচা চালানর দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিল। কখনও দুঃখ, কখনও সামান্য সুখ—দিনগুলো কাটতে লাগল এইভাবেই। দেখতে দেখতে ক্লাস নাইনে উঠে গেল স্নেহা। স্কুলে সেই অর্থে স্নেহার কোনো প্রিয় বন্ধু ছিল না ; সহপাঠীদের সঙ্গে পড়াশুনা নিয়ে যতটুকু কথাবার্তা হতো সেইটুকুই। ক্লাস নাইনে উঠে স্নেহা লক্ষ করল তার পাশে একজন নতুন ছাত্রী একমাথা কুঁচবরণ কোঁকড়া চুল নিয়ে বসে আছে। কিন্তু স্নেহার মতোই সে অত্যন্ত লাজুক। প্রথম দৃষ্টি বিনিময়েই স্নেহা অনুভব করতে পেরেছিল অন্তরের সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনা আদান প্রদানের, একের দুঃখ অন্যের উপলব্ধি করার

একটা অদৃশ্য সেতু যেন দুজনের মধ্যে এক নিমেষেই তৈরি হয়ে গেল। বন্ধুত্বহীন জীবনে এল একটা মিষ্টি হাওয়া। মেয়েটির নাম—বন্যা ; স্নেহা আর বন্যা দুজনে দুজনকে ভালোবেসে ফেলল।

বন্যা বিরাট ধনী পরিবারের মেয়ে হলেও মানসিকভাবে সে ছিল নিঃসঙ্গ, দুঃখী। বাবার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বন্যার মা, ওর খুব ছোটবেলাতেই বেছে নিয়েছিল আত্মহননের পথ। বন্যার বয়স তখন মাত্র দু'বছর। সেই সময় থেকেই একজন আয়ার কাছে মানুষ হয়েছে ও। বড়লোকের মেয়ে, অভাব নেই কোনো কিছুরই, কিন্তু বন্যা বঞ্চিত বাবা-মার স্নেহ ভালোবাসা থেকে। একটু বড় হতেই বন্যা বুঝে যায় যে, আয়া তার আসল মা নয়, শুধুই তাকে দেখাশুনা করা আয়ার কাজ। আক্ষেপ করে মাঝে মাঝেই আয়াকে সে বলে ওঠে, কেন তুমি আমাকে 'মা' বলে ডাকতে শেখাও নি? কেন? আমার কেউ নেই! কেউ না, কেউ না! বন্যার এই নিঃসঙ্গ একাকীত্ব অনেকটাই মুছে গেল স্নেহাকে পাশে পেয়ে। বন্যার সৎমা অতি আধুনিকা, বাড়িতে প্রায় প্রতিদিনই নানারকম আসর বসত ; জাঁকজমকে ভরা এই সন্ধ্যাগুলো বন্যার কাছে ছিল অসহ্য। প্রতিটি মুহূর্তে এই যন্ত্রণা বন্যা নিজের বুকে বয়ে বেড়াত। স্নেহাকে সঙ্গে পেয়ে এই মানসিক যন্ত্রণা একটু একটু করে ভুলতে শুরু করল বন্যা, মনের অনেকটাই সে স্নেহার কাছে উজাড় করে দিল।

পর পর তিনদিন বন্যা স্কুলে আসেনি। স্নেহার চিন্তা বাড়ে। স্কুলে যাওয়ার নাম করে একদিন বেরিয়ে পড়ে স্নেহা, বন্যার খোঁজ নিতে। অনেক চেষ্টায় পাওয়া যায় ওদের বাড়ি। 'বন্যা—বন্যা—বন্যা, আমি স্নেহা,।' কোনো সাড়াশব্দ নেই। কিছুক্ষণ বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকার পর একজন মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা এসে দরজা খোলেন। ফিসফিস করে স্নেহাকে বলেন, চুপ, কোনো কথা বোলো না। ওপরে গান বাজনা, বাবু-বিবিদের আসর বসেছে ; তুমি আমার সঙ্গে এস। বিরাট অট্টালিকা, সুন্দর ভাবে সাজানো গোছানো, তারই একতলায় কোণের দিকে একটা ঘরে থাকে বন্যা এবং তার সেই অভিভাবিকা—আয়া। দোতলার সঙ্গে একতলার যেন কোনো সম্পর্কই নেই—যেন দুটো আলাদা জগৎ!

বন্যা—বন্যা, আমি স্নেহা, কী হয়েছে তোর, বলে ওঠে স্নেহা। বন্যা তখন

প্রচণ্ড জ্বরে বেহুঁশ। অস্ফুটে মাঝে মাঝে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে, মা মাগো, মা কোথায়! বন্যার এই অবস্থা দেখে কেমন বিহ্বল হয়ে যায় স্নেহা, বসে পড়ে ওর মাথার কাছে। বন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করে, জ্বরের প্রকোপটাও যেন একটু কমে আসে বন্যার। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যেই সে ভাবতে থাকে তার মাথায় এই স্নেহের স্পর্শ কার? এই ভালোবাসার আন্তরিক ছোঁয়াটুকু কার? কার? তবে কি তার সৎমা তাকে এতদিন পরে আপন করে নিতে এল? একটা মিষ্টি সুন্দর অনুভূতি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে বন্যা। ঘুম ভাঙতেই ভুল ভাঙে বন্যার, চেয়ে দেখে মাথার কাছে বসে আছে স্নেহা—স্নেহের ডালি নিয়ে, ভালোবাসার ঐশ্বর্য নিয়ে। দুজনেই দুজনকে জড়িয়ে ধরে পরম আবেগে। সন্ধে হয়ে আসছে, স্নেহাকে এবার বাড়ি ফিরতে হবে। ছাড়তে চায় না বন্যা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্নেহাকে বাড়ি ফেরার জন্য বন্যাকে ছেড়ে উঠতেই হয় সেই সঙ্গে দিয়ে আসতে হয় প্রতিশ্রুতি—আবার আসব।

শরীর একটু সুস্থ হতেই আবার স্কুলে যেতে শুরু করল বন্যা। বন্যার সঙ্গে স্নেহার সম্পর্ক এখন আরও বেশি আন্তরিক, প্রগাঢ় ভালোবাসার। সামনে দুজনেরই ম্যাট্রিক পরীক্ষা, তাই পড়াশুনার চাপ একটু বেশিই। বন্যাদের পরিবারে আর্থিক অনটন ছিল না ; বন্যা জানত বই কেনার মতো সামর্থ্য স্নেহার নেই তাই প্রতিদিনই স্নেহা বন্যার বই থেকে খাতায় লিখে নিয়ে যায়। বন্যা একদিন তার সব কটা বই স্নেহাকে দিয়ে স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরেই কান্নাকাটি করতে শুরু করল। আয়া গিয়ে ওর বাবাকে বলল, বন্যার সমস্ত বই চুরি হয়ে গেছে একটাও পড়ার বই নেই। পরেরদিনই বন্যার জন্য এসে গেল আরেক সেট নতুন বই। স্নেহাকে আর বন্যার বই থেকে লিখে নিয়ে যেতে হলো না। বন্ধু যে তার জন্যই এত বড় একটা ছলনার আশ্রয় নিয়েছে স্নেহা জানতেও পারেনি। জানল একদিন ঘটনাচক্রে, কিন্তু তখন কিছুই করার নেই ; মনে মনে অনুভব করল—এই হচ্ছে বিধির বিধান, দুঃসময়ে আসল বন্ধুত্বের সন্ধান। বন্ধুর পথ একদিকে যেমন বন্ধুর অন্যদিকে মধুরও বটে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা। দুজনের সিট পড়েছে পাশাপাশি। ম্যাট্রিক পরীক্ষা বলে কথা, বন্যার বাড়ি থেকে টিফিনে নানারকমের খাবার আসত। স্নেহা জানত বন্যা খাওয়ার জন্য তাকে খুঁজে বেড়াবে। তাই পরীক্ষার প্রথমার্ধ শেষ হওয়া

মাত্র বন্যাকে স্নেহা জানিয়ে রাখতো, দেখ বন্যা, বাবা আসবেন, আমি বাবার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসব। একটু দূরে গিয়ে, জল খেয়ে খিদে মিটিয়ে পড়াশুনা করে স্নেহা আবার আসত পরীক্ষার হলে। ইংরেজি প্রশ্ন খুব কঠিন হয়েছে। স্নেহা বরাবরই পড়াশুনায় ভালো, লিখতে ওর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু বন্যা কিছুটা লেখার পর আর লিখতে পারছে না। স্নেহাকে বিরক্ত না করে বন্যা শুধু প্রশ্ন-পত্র দেখছে আর খাতা ওলটাচ্ছে। স্নেহা কিন্তু লিখতে লিখতেই লক্ষ করেছে যে বন্যা ঠিক মতো উত্তর লিখতে পারছে না। লিখতে লিখতেই স্নেহার মনে পড়ে যায়—আজ যে সে পরীক্ষার হলে বসে উত্তর লিখতে পারছে সে তো বন্যারই জন্য, বন্যাই তো তার সমস্ত বই দিয়েছিল স্নেহাকে। কিছু একটা করতেই হবে বন্যার জন্য, নাহলে সেটা হবে চরম অকৃতজ্ঞতা।

পরীক্ষা শেষ হতে বাকি মিনিট চল্লিশেক। স্নেহার আর একটা প্রশ্নের উত্তর লেখা বাকি। কিন্তু আর তো দেরি করা চলে না। এই প্রশ্নটার উত্তর না লিখলেও সে যা লিখেছে তাতে ভালোভাবেই পাশ করে যাবে। বন্যাকে সাহায্য করতেই হবে, অথচ দিদিমণির চোখ এড়ানো খুব মুশকিল। মাথা থেকে হঠাৎই একটা বুদ্ধি বার করে স্নেহা। নিজের প্রশ্নপত্রের ওপর খুব ছোট ছোট করে লেখে বন্যার উদ্দেশে, আমি বাথরুমে যাব এই সুযোগে তোর আর আমার খাতা দুটো পালটা-পালটি করে নে, তারপর যা মনে হয় আমার খাতায় কিছু একটা লিখে সেটা পরে কেটে দিস। এরপর হঠাৎই স্নেহা একটু বমি করার ভান করে ; ছুটে আসেন দিদিমণি সেই সুযোগ সকলেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন, স্কুলের আয়া ছুটে আসে জল নিয়ে। ধরাধরি করে স্নেহাকে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হয়। বাথরুমে যাওয়ার সময় স্নেহা চালাকি করে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার ভান করে, ফলে স্নেহা, বন্যা দুজনেরই খাতা, প্রশ্নপত্র নীচে পড়ে যায়। খাতা, প্রশ্নপত্র নীচ থেকে তুলতে গিয়ে বন্যা স্নেহার লেখাটা দেখতে পায়, সঙ্গে সঙ্গেই বন্যা নিজের খাতাটা স্নেহার জায়গায় রেখে স্নেহার খাতাটা নিজের কাজে নিয়ে নেয়। বাথরুম থেকে চোখে মুখে জল দিয়ে ফিরে আসে স্নেহা। নিজের জায়গায় বন্যার খাতা দেখে বুঝতে পারে তার ইচ্ছেমতোই কাজ হয়েছে। আর মাত্র আধঘণ্টা বাকি পরীক্ষা শেষ হতে। দারুণ টেনশন। হাতের লেখাটাকে অন্যরকম করে বন্যার খাতায় লিখে চলে স্নেহা। ইচ্ছে করলে

শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে সবার শেষে দিদিমণিকে খাতা জমা দিতে পারত স্নেহা। কিন্তু তাতে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়। তাই খাতা বদলের পালায় পরীক্ষার শেষ ঘণ্টা পড়মাত্র দুই বন্ধু যেন একটু অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো করে খাতা জমা দিয়ে দেয়। বন্ধুত্বের ঋণশোধ এইভাবে একজনকে আরেকজনের কাছে চিরঋণী করে রাখে।

পরীক্ষা শেষ। তিনমাস পর রেজাল্ট। বন্যার সঙ্গে স্নেহার খুব কমই দেখা হয়। বন্যা তার বাড়িতে, স্নেহা অন্য চিন্তায় ব্যস্ত। কয়েকদিন যেতে না যেতেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন স্নেহার বাবা—অনাময়বাবু। এবার এগিয়ে আসে স্নেহা ; একদিন রাতে বাবাকে সে বলে, বাবা, তুমি আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছ, এখন কিছুদিন বিশ্রাম নাও, শরীরটাকে ঠিক কর, তোমার দোকানে এখন থেকে আমি বসব। কথা দিচ্ছি, সংসার চালানোর দায়িত্ব পুরোটাই আমার। অনাময়বাবু নারাজ ; মেয়ে বসবে দোকানে? যে অনুরোধ আসা উচিত ছিল ছেলেদের কাছ থেকে সেই অনুরোধ আজ মেয়ের মুখে? না-না, এ হতে পারে না। অনাময়বাবু পরামর্শ করেন স্ত্রী সান্ত্বনা দেবীর সঙ্গে। বাবা-মা, দুজনেরই অগাধ বিশ্বাস মেয়ের ওপরে। কিন্তু মেয়ে দোকানে বসলে লোকে বলবে কী—এই চিন্তাতেই দুজনে আকুল। স্নেহাও ছাড়াবার পাত্রী নয়। ইস্পাত-দৃঢ় কৃণ্ঠে বাবা-মাকে সে জিজ্ঞাসা করে, লোকে কী বলবে, এই ভেবে যদি তোমরা বসে থাক তাহলে বাবার অবর্তমানে আমাদের সংসার কি আত্মীয়স্বজনরা চালাবে? পদে পদে সমাজব্যবস্থার দোহাই দিয়ে যারা মেয়েদের দুর্নাম করে বেড়ায় তারা কি এসে আমাদের সংসার চালানোর দায়িত্ব নেবে? যে যা ইচ্ছে বলে বলুক, তোমরা যদি আমার ওপর ভরসা রাখো তাহলে আমিও তোমাদের ভরসা দিচ্ছি, তোমাদের মাথা নত হয় এমন কোনো কাজ কোনোদিনই করব না ; তবে হ্যাঁ, আমার প্রতি সামান্যতম অবিশ্বাসও যদি তোমাদের কোনোদিন জন্মায় সেদিন কিন্তু আমি আর থাকব না। সান্ত্বনা দেবী অনুরোধ করেন ছেলেদের, তোরা একেকজন একদিন করে দোকানে সময় দে বাবা, ঘরের মেয়ে দোকান চালালে লোকে বলবে কী? বড় ছেলের উত্তর, আমি ওই দোকানে বসে চাল-তেল বিক্রি করতে পারব না, ভালো চাকরি পেলে করব। মেজো ছেলের ঘোষণা, না-না, অসম্ভব, আলু-পেঁয়াজ বিক্রি করে বন্ধুদের কাছে গিয়ে মুখ দেখাতে পারব না। একমাত্র ছোট ছেলেই

বলল, মা আমি স্নেহাকে সাহায্য করব। সব শুনে স্নেহা বলল, না, ছোড়দা এখন সবে কলেজে পড়ছে, ওর পড়াশুনা শেষ না হলে ওকে আমি কিছুতেই দোকানে বসতে দেব না। ছোড়দার পড়াশুনার খরচ চালানোর দায়িত্ব আমার; তোমরা ওকে ভালো করে পড়াশুনা করতে দাও।

স্নেহার পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোতে তখনও বাকি মাস-দুয়েক। কিন্তু স্নেহার আর পড়াশুনার দিকে মন নেই, সংসারের দুঃখকষ্ট কীভাবে দূর করা যায় সর্বক্ষণের চিন্তা সেটাই। প্রথম প্রথম, কয়েকদিন অনাময়বাবু দোকানে থেকে স্নেহাকে দোকান চালানোর সব খুঁটিনাটি দেখিয়ে দিলেন। তারপর থেকে স্নেহাই দোকান চালাতে শুরু করল। মাঝে মধ্যে অনাময়বাবু দোকানে এসে বসতেন, দেখতেন মেয়ের কাজকর্ম আর ভাবতেন, কী নিষ্ঠুর বিধাতা! যে মেয়ে রাজরানী হতে পারত ভাগ্যের পরিহাসে সে আজ 'দোকানি'! মানসিকভাবে এটা তিনি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। একটা মানসিক কালবৈশাখী ক্রমাগত বিবেকদংশনের ঝড় বইয়ে দিচ্ছিল। আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন অনাময়বাবু, মাঝে মধ্যেই জ্বর, পেটে অসহ্য ব্যথা, খিদে নেই, ঘুম নেই ; সব কিছু চেপে রেখেছিলেন এই ভেবেই যে ডাক্তার দেখানো মানেই তো হাটে হাঁড়ি ভাঙা। ওষুধের পর ওষুধ, খরচ—স্নেহার ওপর চাপ বাড়বে। অথচ ছেলেদের কোনো মাথাব্যথা নেই। একটা একরত্তি মেয়ের ওপর গোটা সংসারের ভার, এছাড়াও তিন ছেলের হাতখরচা চালানোর দায়িত্বও ওই ফুটফুটে মেয়েটার। স্নেহা অবশ্য এটা মেনে নিয়েছিল হাসিমুখে সামাজিক কর্তব্য হিসাবে।

এইভাবেই একদিন স্নেহা দোকান চালানোতে পটু হয়ে উঠল। অভাবের সংসারে দেখা গেল হাসির ঝিলিক। কিন্তু স্নেহার সংগ্রামী জীবন-সুখ স্বল্পস্থায়ী, বলেই হয়ত দুর্দিনের অশনি-সঙ্কেত আবারও দেখা গেল গোলাপের কাঁটার মতোই। শারীরিক যন্ত্রণা, মানসিক অস্থিরতা ক্রমশই তীব্রতর হচ্ছিল অনাময়বাবুর, সহ্য করতে না পেরে একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। ডাক্তার দেখানো হলো, সবাই শঙ্কিত ; বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডাক্তারবাবুর রিপোর্ট পাওয়া গেল—অনাময়বাবু দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত! পলকে হাসির ঝিলিকটুকু উধাও হল মিত্র পরিবার থেকে। বাবার চিকিৎসা আর পথ্য জোগাতে স্নেহা হিমশিম।

এদিকে অনেকদিন হয়ে গেল বন্যার সঙ্গে স্নেহার কোনো যোগাযোগ নেই। বন্যা ভাবছে স্নেহা হয়ত অন্য কলেজে ভর্তি হয়ে তাকে ভুলেই গেছে। সময় করে একদিন ছুটে এল বন্যা স্নেহাদের বাড়িতে। স্নেহার বাবাকে নিয়ে পরিবারের সবাই তখন উদ্বিগ্ন ; স্নেহা দোকান চালাচ্ছে—এতসব দেখে বন্যা হতভম্ব! পড়াশুনা আর করবে না বলেই স্নেহা ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট পর্যন্ত স্কুল থেকে নিয়ে আসেনি। বন্যার কাছেই মিত্র পরিবার খবর পেল, স্নেহা ম্যাট্রিকে প্রথম বিভাগ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মেয়ের সাফল্যের খবর পেয়ে অনাময়বাবু আনন্দে আকুল, সান্ত্বনা দেবী গর্বে উদ্বেলিত। স্নেহাকে ডেকে পাঠানো হলো দোকান থেকে। মিলিত খুশির এই উৎসবের মধ্যে বসে বোধহয় বিধাতা অলক্ষে হাসছিলেন! স্নেহা দোকান থেকে আসতেই অনাময়বাবু মেয়ের হাত দুটো ধরে ছোট্ট শিশুর মতো ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, বললেন, মা তোর ভবিষ্যৎ আমি শেষ করে দিয়েছি, এই যন্ত্রণার বোঝা আমি আর বইতে পারছি না রে, তুই আমাকে ক্ষমা কর মা, আমাকে তুই ক্ষমা কর...। কথা বলতে বলতেই নিজের দুটো হাত মেয়ের মাথায় রেখে আশীর্বাদ করলেন ; তারপর কয়েক সেকেন্ড—নিথর হয়ে এল অনাময়বাবুর দেহটা, চোখদুটো স্থির। ডাক্তার! ডাক্তার!—জল! জল! সবার সম্মিলিত চিৎকার। কিন্তু না ; আর কোনো উপায় নেই অনাময়বাবুকে ইহলোকে ফিরিয়ে আনার। সবাইকে শোকসাগরে ভাসিয়ে চিরবিদায় নিলেন মিত্র পরিবারের বটবৃক্ষ। পড়ে রইল তাঁর শাখা-প্রশাখা ভবিষ্যৎ জীবনসংগ্রামের জন্য।

অনাময়বাবু যতদিন বেঁচে ছিলেন, পরিবারের কেউ স্নেহাকে কটু কথা বলতে সাহস পায়নি। বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক একটা ঘটনার ঝড় তার অন্তরটাকে ক্রমশই দুমড়ে মুচড়ে দিতে লাগল। এতদিন স্নেহা দোকানের পুঁজি ঠিকঠাক রেখে বাদবাকি পয়সায় সংসার চালাত ; কেউ কোনোদিন তাকে সন্দেহের চোখে দেখেনি বা কোনো হিসাবনিকাশের কৈফিয়তও তার কাছে চায়নি। বাবার মৃত্যুর পর হঠাৎ করেই ছেলেদের মনে হলো বাবার ব্যবসার রোজকার হিসাবটা নেওয়া খুবই জরুরি। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে দোকান চালিয়ে, বাড়ি ফিরে আসার পর স্নেহা লক্ষ করত মা যেন দাদাদের সঙ্গে কিছু আলোচনা করছেন ; কিন্তু তাকে দেখলেই সবাই যেন কিরকম

গম্ভীর চুপচাপ হয়ে যাচ্ছেন। একটা অবিশ্বাসের গন্ধ স্নেহা টের পাচ্ছিল।

আলোচনার বিষয়বস্তু জানার জন্য স্নেহা একদিন একটু চালাকির আশ্রয় নিল। অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু তাড়াতাড়িই ফিরে এল বাড়িতে, কিন্তু সামনের দরজা দিয়ে বাড়িতে না ঢুকে, পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে সবার আড়ালে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে রইল। বড়দা আর মেজদার গলা কানে এল, দুই ভাই মা'কে বলছে, মা, স্নেহা সংসার চালানোর নাম করে আসলে নিজের নামে টাকা বানাচ্ছে, ব্যবসার সব অধিকার এভাবে স্নেহাকে দিলে তো চলবে না, স্নেহার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে ; একদিন তো নিজের সংসার করবার জন্য সব পুঁজি নিয়ে ও চলেও যেতে পারে ; ছোড়দা স্নেহাকে খুব ভালোবাসত তাই প্রতিবাদটা এল ওর দিক থেকেই, বড় দুই ভাইকে সোজাসুজিই বলল, কী বলছ তোমরা? তোমাদের লজ্জা হয় না? আমরা আসলে এক-একটা অপদার্থ—ছোট বোনের ঘাড়ের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে খাচ্ছি আর ফুর্তি করছি ; যে আমাদের সবার জন্য বাণিজ্যিক পৃথিবীর হাড়িকাঠে নিজের ভবিষ্যৎকে বিনা দ্বিধায় বলি দিল তাকে তোমরা আ[illegible] এইভাবে সন্দেহ করছ! ছিঃ ছিঃ! স্নেহা যদি কোনদিন এসব কথা শুনতে পায় তাহলে দারুণ দুঃখ পাবে। বন্ধ কর এই চক্রান্ত, বন্ধ কর। আগে নিজের রোজগার কর তাহলে বুঝবে জীবনটা কত কঠিন! তর্কটা হয়ত অনেকক্ষণ ধরেই চলত। বাধা দিলেন সান্ত্বনা দেবী, বললেন, ঠিক আছে বাবা, তোরা যা বলছিস তা-ই হবে, আমি স্নেহাকে ডেকে দোকানের ব্যাপারে সব জানতে চাইব।

পিছনের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে স্নেহা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, শেষ পর্যন্ত মা-ও তাকে অবিশ্বাস করছে! বাবার মৃত্যুর পর যে মা ছিল তার একমাত্র ভরসা সেই মা-ও ভাবছে, স্নেহা নিজের জন্য গোছাচ্ছে! একটা মাত্র শব্দই যেন বারবার তার কানে অনুরণিত হতে থাকে—অবিশ্বাস-অবিশ্বাস-অবিশ্বাস অবিশ্বাস! বিদ্রোহের মেঘ জমে ওঠে স্নেহার মনের মধ্যে, লজ্জায়, ঘৃণায় বারবার আঁতকে উঠতে থাকে সে। রাতেই সিদ্ধান্ত নেয়—আর নয়, এই অবিশ্বাসের ঘেরাটোপ থেকে তাকে চলে যেতেই হবে এবং আজই। একটা ছোট ব্যাগে সামান্য কয়েকটা জিনিস গুছিয়ে নেয় স্নেহা ; সূর্যোদয় হওয়ার আগেই নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানার সন্ধান না নিয়েই পথভোলা এক পথিকের

মতোই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে সে। মা'র জন্য রেখে যায় একটা অতিসংক্ষিপ্ত চিঠি :

মাগো, তোমাদের সব আলোচনা আমি শুনেছি। বাবা নেই, আজ আমি তোমাদের পথের কাঁটা। অবিশ্বাস নিয়ে আমি তোমাদের বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। সব কিছু রেখে গেলাম যেহেতু আমার নিজের জন্য কিছুই গোছানোর নেই। তোমাদের স্নেহা আজ তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে—সে আজ একদম একা। খোঁজ করার চেষ্টা কোরো না, মনে কোরো, বাবার মতোই আমারও চিরবিদায়। তোমাদের অবিশ্বাসের কাছে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। সবাই ভালো থেকো। প্রণাম নিও।

ইতি

অবিশ্বাসী স্নেহা।

বাসস্ট্যান্ডে স্নেহা এসে যখন দাঁড়ায়, ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। প্রায় আধঘণ্টা স্নেহা দাঁড়িয়েই থাকে সেখানে—কোথায় যাবে সে? আপনজন বলতে তার তো কেউ নেই। বন্যার কথা মনে পড়ে, কিন্তু না—বন্যারও তো অসহায় অবস্থা, ওকে বিরক্ত করা কি ঠিক হবে? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই হঠাৎই মনে আসে আদ্যাপীঠের কথা—আদ্যাপীঠ শান্তির পীঠস্থান, সেখানেই যাবে স্নেহা। ফার্স্ট বাস এসে দাঁড়ায় স্ট্যান্ডে, যন্ত্রচালিতের মতো বাসে ওঠে স্নেহা, বাস চলতে শুরু করে।

আদ্যাপীঠ—বড় শান্তির জায়গা, শাদা পাথর দিয়ে তৈরি সুউচ্চ মন্দির—সামনে বিশাল নাটমন্দির। স্নেহা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে নাটমন্দিরে, একসময় উঠেও পড়ে সেখান থেকে। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায় দক্ষিণেশ্বরের দিকে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির—ঠিক গঙ্গার পাশেই। পূতসলিলা সর্বতীর্থময়ী কলকলনাদিনী গঙ্গা—ঘাটে সুবিস্তীর্ণ সিঁড়ি। সিঁড়িতেই বসে পড়ে স্নেহা ; কত তীর্থযাত্রী গঙ্গাস্নান করে 'ভবতারিণী মা কালী' দর্শন করতে চলেছেন। স্নেহার চোখ চলে যায় অদূরে পঞ্চবটীর দিকে। গঙ্গার ধারে বসে স্নেহার মনে পড়ে ফেলে আসা দিনগুলির কথা। বাবার মুখটা বারবার ভেসে ওঠে মনের মধ্যে। ভাবতেই থাকে স্নেহা—এরপর কোথায় যাবে! একবার ভাবে দক্ষিণেশ্বরের স্বামীজিদের কাছে আশ্রয় নিয়ে বাকি জীবনটা আশ্রমিক হিসাবেই কাটিয়ে দেবে ; আবার কখনও নিজের হতভাগ্য জীবনের প্রতি চরম

বিতৃষ্ণায়, হতাশায় পবিত্র গঙ্গাবক্ষে প্রাণ বিসর্জন দিতে চায়। মনে মনে কর্তব্য স্থির করে নেয় স্নেহা, সোজা চলে যায় মন্দিরের দিকে, অনেকক্ষণ ধরে মা কালীর মুখ দর্শন করে, চোখের জলে জানায় অন্তরের আকুতি ; তারপর আস্তে আস্তে মন্দির প্রাঙ্গণ ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসতে গঙ্গার দিকে ; গঙ্গার পবিত্র জলরাশি যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছে!

আর মাত্র কয়েকটা ধাপ, তারপরেই নিশ্চিন্ত আশ্রয়। হঠাৎই স্নেহার চোখদুটো পেছন থেকে কে যেন চেপে ধরল। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল স্নেহা—'কে? কে?' হাত দুটো যে তার খুব পরিচিত, এ হাত তবে কার? প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাতদুটো সরে গেল স্নেহার চোখের ওপর থেকে, হাসতে হাসতে পেছন থেকে স্নেহার সামনে এসে দাঁড়াল—বন্যা! স্নেহা কিছু বলার আগেই বন্যা বলে উঠল, কী রে স্নেহা, তুই একা একা মন্দিরে, ব্যাপার কী? কোনো সুপ্ত মনস্কামনা আছে নাকি? বল—আমাকে এক্ষুণি বলতে হবে। বন্যা তখনও জানে না স্নেহার সর্বশেষ সর্বনাশা সিদ্ধান্তের কথা।

বন্যাকে পেয়ে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না স্নেহা। তোর সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা, আমি আর পারছি না রে বন্যা—বলতে বলতে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে স্নেহা। আস্তে আস্তে অবস্থা একটু স্বাভাবিক হতে স্নেহার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনাই জানতে পারে বন্যা ; সব শুনে বন্যা নির্বাক

এদিকে স্নেহা ও বন্যার কথোপকথনের সময় কাছেই দাঁড়িয়েছিল এক যুবক—বন্যার হবু-স্বামী, সে কিন্তু পুরো ঘটনাটাই শুনে ফেলেছে ; আর বন্যাও ভুলে গেছে প্রিয়তম বন্ধুর সঙ্গে হবু-স্বামীর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা স্নেহাকে অবাক করে দিয়ে বন্যা বলল, ভুলেই গেছি তোকে বলতে, আলাপ করিয়ে দিই—আমার ভবিষ্যৎ—'আশ্চর্য', ও খুব ভালো রে। আয় ভুলে যাই পুরনো দিনগুলোর কথা, আমরা যখন বেঁচে আছি তখন তোর বেঁচে থাকারও কোনো অসুবিধা হবে না, সে দায়িত্ব আমাদের ; প্লিজ, তুই একদম মন ভাঙিস না, চল আমরা আবার নতুন করে জীবন শুরু করি। আশ্চর্য এগিয়ে এল স্নেহার দিকে, সপ্রতিভভাবে হাতজোড় করে নমস্কার করে বলল, বন্যার মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আলাপ করার সৌভাগ্য এই প্রথম। যদি মনে কিছু ন করেন তাহলে আমার দিক থেকে একটা প্রস্তাব আছে—আমাদের বাড়িতে মানুষ বলতে দুজন, আমি এবং আমার বিধবা মা ; মায়ের খুব ইচ্ছে একজনকে

মেয়ে হিসাবে গ্রহণ করার কিন্তু সুযোগ আর কোথায় বলুন! তাই বলছিলাম আজ থেকে আমি আপনাকে বোনের জায়গাটা দিতে চাই, আমার মা'র অনেকদিনের ইচ্ছে পূর্ণ হবে আপনাকে পেলে। কী বন্যা, এতে তোমার মত আছে তো?

বন্যার কাছে এতো মেঘ না চাইতেই জল। দারুণ খুশিতে ডগমগ বন্যা আশ্চর্যকে বলল, চলো, তাহলে আমরা দুই বন্ধু মিলেই মার কাছে যাই—মা খুব খুশি হবেন স্নেহাকে পেয়ে। স্নেহা ভাবছে, কী করবে? যাওয়া কি উচিত হবে ওদের সঙ্গে। দোদুল্যমান অবস্থায় স্নেহা বলল, না-রে বন্যা, তোরা শান্তিতে থাক, আমি এখন আমার নিজের কাছেই বোঝা হয়ে গেছি। তোদের সুখের সংসারে আমি আর দুঃখের ছায়া ফেলতে চাই না। স্নেহার চোখে জল।

এবার বন্যা হয়ে গেল স্নেহার অবিভাবক। ধমকানোর সুরেই বলল, স্নেহা, তুই ভাবিস না যে তোর কেউ নেই, আর তুই তোর ইচ্ছেমতো চলবি। যা বলছি তাই তোকে করতে হবে, এখন থেকে আমরাই তোর গার্জেন, বুঝলি! আমাদের সঙ্গে যদি যেতে না চাস্ তাহলে তোকে জোর করেই নিয়ে যাব, হ্যাঁ, জোর করে। বন্যার এই ভালোবাসার কাছে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল স্নেহা। বন্যা-স্নেহা-আশ্চর্য, তিনজন রওনা দিল আশ্চর্যদের বাড়ির দিকে।

'মা মা'—বাড়িতে পৌঁছেই আশ্চর্যের চিৎকার। মা দেখো, তোমার মেয়ে খুঁজে পেয়েছি, তোমার মনের মতো মেয়ে মা' তো এক নিশ্বাসে গড়গড় করে বলে চলে আশ্চর্য, 'মা—ও স্নেহা, বন্যার বন্ধু, মনের দুঃখে এক মাকে ছেড়ে এসেছে, আমি ওকে জোর করেই নিয়ে এসেছি তোমার কাছে—হ্যাঁ, মা তোমার কাছেই ওকে অর্পণ করলাম। একটু ওকে সামলে রেখো মা, ও কিন্তু খুব অভিমানী ; কোনোভাবেই ও যেন কোনো কষ্ট না পায়, নাহলে আবার কিন্তু ও চলে যাবে কোনো এক অজানা পথে। স্নেহা বাকরুদ্ধ—সামনে দাঁড়িয়ে 'মা', পা ছুঁয়ে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে তাঁকে। মা-ও দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করে বুকে টেনে নেন স্নেহাকে।

বন্যার ফিরে যাওয়ার সময় হয়, যাওয়ার সময় সস্নেহে স্নেহাকে বলে যায় বন্যা, স্নেহা তোকে মার কাছে রেখে গেলাম, তোর যা যা দরকার কালকে আমি তোকে সব দিয়ে যাব। কিন্তু আজ থেকে একটানা সাতদিন তোর একদম

'রেস্ট', তারপর চিন্তা করব তুই আবার পড়াশুনা শুরু করবি অথবা গান শিখবি। হবু-শাশুড়িকে প্রণাম করে বন্যা বলে, মা, তুমি তো এখন থেকে আর একা নও, তোমার মেয়ে পেয়ে গেছ, তোমার ছেলে তো সারাদিনই বাড়ির বাইরে থাকে, কথা বলার সাথী তুমি পেলে, বল খুশি কি না? বন্যার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে মা বললেন, তোমরা বেঁচো থাক মা, এতবড় বাড়িতে একা থাকি, এক-একসময় নিজেকে কেমন অসহায় মনে হয়, বাড়িটায় একটা প্রাণের স্পন্দন ফিরে আসুক—আমি শুধু এইটুকুই চাই।

বন্যা ফিরে গেল। স্নেহা একটু চুপ করেই বসে রইল ; বন্ধুর হবু-শ্বশুরবাড়িতে তার থাকাটা কতখানি সঙ্গত—ভাবনার বিষয় সেটাই। কিন্তু আশ্চর্য ও তার মা সত্যিই প্রথম দিন থেকেই স্নেহাকে একদম আপন করে নিল, ওদের আন্তরিকতায় স্নেহা মুগ্ধ। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে আশ্চর্যর মা ও স্নেহা অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে ; কথা বলতে বলতেই ঘুমিয়ে পড়েন মা, স্নেহার ঘুম আসে না ; আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে বেরিয়ে ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্নেহা—মাথার ওপর রাতের আকাশ, তরল অন্ধকারের বুকে তারার ঝিকিমিকি ; নিঝুম রাতের একাকিত্বকে সাক্ষী রেখে স্নেহা ভাবতে থাকে—জীবনটা যেন সত্যিই একটা নাটক—এক-একটা পর্বে এক-একটা অগ্নিপরীক্ষা। নিজের অজান্তেই বহু দিন পরে স্নেহার ভেতরে বেজে ওঠে সুরের রাগিণী, গান গেয়ে ওঠে স্নেহা—'আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস জ্বেলে করব নিবেদন, আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।'

গান শেষ করে তন্ময় হয়ে যায় স্নেহা। হঠাৎই কারও পায়ের আওয়াজে চমকে ওঠে স্নেহা—এত রাত্রে কে তার পিছনে দাঁড়িয়ে? পিছন ফিরে তাকাতেই লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে স্নেহা—দেখে আশ্চর্য ও তার মা, স্নেহার গান শুনে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে ছাদের ওপর। মা যেন আবেগে আপ্লুত স্নেহার গান শুনে, সেখানে দাঁড়িয়েই মার হুকুম হলো ছেলেকে—স্নেহার গান শেখার জন্য যা যা প্রয়োজন কাল থেকেই সব চাই, স্নেহা গান শিখবে, শিখতেই হবে ওকে।

আশ্চর্য একজন অই. পি. এস. অফিসার, সারাদিনই কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় ওকে। তাই আশ্চর্য মাকে বলে, মা তোমার যা যা ফরমাশ আছে—কালকে বন্যা আসবে, ওকে বল, ও সব ব্যবস্থা করে দেবে। পরের দিন বন্যা আসতেই

মার হুকুম হলো, স্নেহার জন্য আজই হারমোনিয়াম চাই, তবলা চাই, স্নেহা গান শিখবে। মার আদেশ শিরোধার্য করে বেরিয়ে পড়তেই হলো দুই বন্ধুকে। সেইদিন এসে গেল হারমোনিয়াম, তবলা ; ঠিক হয়ে গেল গানের শিক্ষক—এক মাকে ছেড়ে এসে আরেক মায়ের ইচ্ছায়, আবদারের প্রায় ৩০ বছর পর স্নেহাকে আবার হারমোনিয়াম ধরতে হলো, শুরু হলো গান শেখা।

এইভাবেই দিন চলে যায় মা, মেয়ের। বন্যা মাঝে মাঝে আসে, গল্প করে চলে যায়। আশ্চর্য ও বন্যার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেলেও, আশ্চর্য গোয়েন্দা দফতরের বড় অফিসার, হাতে কতকগুলো কঠিন তদন্তের কাজ, তাই সে বন্যাকে বলেই রেখেছে—বিয়েটা হবে মাস ছয়েক পর। মেনে নিয়েছে বন্যা। কিন্তু বন্যা আর আশ্চর্যর মধ্যে বোঝাপড়া যেমন দারুণ, তেমনি একে অন্যকে ভীষণ ভালোবাসে। বন্যা সব সময় আশ্চর্যর কথা ভাবে ; আশ্চর্য বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত বন্যা বারবার ফোন করে খোঁজ নেয়। বাড়িতে ফিরে এসে তাই আশ্চর্যর প্রথম কাজই হয় বন্যার সঙ্গে ফোনে কথা বলা।

একদিন স্নেহা আর বন্যা দুই বন্ধুতে বসে গল্প করছে, এমন সময় বছর পাঁচেকের একটা ছোট্ট ফুটফুটে বাচ্চা এসে ওদের কাছে জানতে চায়, এটা কী আশ্চর্যবাবুর বাড়ি? স্নেহা, বন্যা দুজনেই একটু অবাক হয়ে যায় ; বাচ্চাটিকে দুজনে ঘরের মধ্যে নিয়ে আসে, ওর কাছে দুজনে জানতে চায় যে বাচ্চাটি কীভাবে আশ্চর্যবাবুর নাম জানল এবং আশ্চর্যবাবুর সঙ্গে তার কি প্রয়োজন? বাচ্চাটি বলে ওঠে, ওনাকে এক্ষুণি খবর দিন, উনি যেন আজ কোথাও না গিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন ; ওনাকে মারার চেষ্টা চলছে। বন্যা, স্নেহা দুজনেই ভয় পেয়ে যায় এতটুকু বাচ্চার মুখে এই কথা শুনে। ওরা সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য'র সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ; কিন্তু আশ্চর্য ততক্ষণে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছে। বন্যা, স্নেহা তখন কোনো উপায় না দেখে বাচ্চাটিকে জিজ্ঞেস করে, সম্পূর্ণ ঘটনাটা কি? উত্তরে বাচ্চাটি পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দেয়। বন্যা, স্নেহা দুজনেই একসঙ্গে কাগজটা পড়ে যেতে থাকে—

বাচ্চাটির বাবার নাম সবিনয় মল্লিক, সবিনয় মল্লিক এক সময় গুণ্ডাদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিল, গুণ্ডারা সেইসময় তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে

অনেক গর্হিত কাজ করিয়ে নেয়। সবিনয়বাবু ছিলেন মল্লিক পরিবারের একমাত্র সন্তান। সবিনয়বাবু ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন মাধুরী নামের একটি মেয়েকে। কিন্তু মল্লিক পরিবারের কেউই এই বিয়েকে মেনে নিতে পারেননি। কারণ মাধুরীদের পরিবার ছিল সাহা পরিবার। নব-পরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে এক জামাকাপড়ে বেরিয়ে পড়েন সবিনয়বাবু, ভবঘুরের মতো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে থাকেন সস্ত্রীক সবিনয়বাবু। ঘুরতে ঘুরতে ওঁরা এসে পৌঁছন হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। সেখানে বসে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েন দুজনে। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় ওদের, দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুজন অপরিচিত যুবক, পুলিশ বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে ওই দুই যুবক সস্ত্রীক সবিনয়বাবুকে থানায় যাওয়ার জন্য বলে। সবিনয়বাবু, মাধুরী দুজনেই বাধ্য হন ওদের সঙ্গে যেতে। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে চমকে ওঠেন ওরা—কোথায় পুলিশ স্টেশন? এতো এক অজানা গুহা! এই গুহার কর্ত্রী হচ্ছেন 'অগ্নিহোত্রী দেবী'—দেবীর অধীনে প্রায় একশজন সাকরেদ যারা প্রত্যেকেই অপরাধজগতের অধিবাসী। দেবী আবার ভালো হাতও দেখতে পারেন। উনি সপ্তাহে একদিন ভক্তদের দর্শন দেন, লাল শাড়ি, লাল চেলি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরিহিত দেবিকে 'ভক্তিময়ী মা' বলে প্রণাম করেন ভক্তরা, দেবীও তাদের খুব ভালো ভালো উপদেশ দেন। দেবীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হন সমাজের বহু বিশিষ্ট মানুষ। কিন্তু এই দেবীই যে অপরাধ জগতের 'মক্ষিরানী', নৈশরাজ্যের অন্ধকারে এই দেবীই যে কতখানি হিংস্র, রক্তলোলুপ—সেকথা ভক্তদের সবারই অজানা।

সস্ত্রীক সবিনয়বাবুকে যখন হাজির করা হল দেবীর সামনে,. দেবী তখন চ্যালা-চামুণ্ডাদের নিয়ে কোন অপারেশনের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করতে ব্যস্ত। নববিবাহিত যুগলকে দেখে কয়েক মিনিটের জন্য চুপ করে গেলেন দেবী, হুকুম দিলেন স্বামী-স্ত্রীকে কয়েকদিনের জন্য একদম আলাদা রাখতে হবে, এই ক'দিন করাও সঙ্গে ওদের দেখা হবে না। সবিনয় মল্লিককে প্রথম দর্শনেই দেবীর খুব পছন্দ হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ইশারার মাধ্যমে ঠিক করে নিলেন গুণ্ডাদের খপ্পরে যখন পড়েই গেছেন তখন সুকৌশলে এখান থেকে বেরোনোর পথ করতে হবে। প্রায় অন্ধকূপের মতো দুটো আলাদা লোহার গারদে স্বামী-স্ত্রীর আলাদা থাকার ব্যবস্থা হলো। পাহারাদার হিসাবে রইল এক

নেপালি পরিবারের স্বামী-স্ত্রী।—এরাও সেই মহিমাময়ী দেবীর শিকার। সবিনয়বাবু এবং তার স্ত্রী, নেপালি দম্পতির কাছ থেকে অনেক ভয়াবহ ঘটনার কথা শুনে শিহরিত।

মাধুরী ভয়ে শুধু কাঁদে আর ভাবে কি করে এই দেবীর হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব? নেপালি স্বামী-স্ত্রীর খুব মায়া হলো ওদের দেখে। কিন্তু করার কি আছে! কারণ প্রত্যেকের পিছনেই লেগে রয়েছে পাহারাদার। নেপালি স্বামী-স্ত্রী দুজন মাঝে মাঝে সবিনয়, মাধুরীকে সান্ত্বনা দেয়, বিশ্বাস রাখ, কষ্ট সহ্য কর, একদিন নিশ্চয়ই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

এইভাবে কেটে গেল ১৫ দিন। হঠাৎই একদিন সকালে লোহার গারদের বাইরে এসে দাঁড়ায় 'রানী সাহেবার' একজন পার্শ্বচর। রানীসাহেবা ডেকেছেন সবিনয়কে। ওরা কাছ থেকে সব ঘটনা জানতে চান দেবী, স্ত্রীকে ছাড়ার জন্য সবিনয়কে নানা প্রলোভন দেখান। সবিনয়বাবু তখন কৌশলগত কারণে রাজি হয়ে বলেন, আমি রাজি, কিন্তু শর্ত একটাই—আমাদের মুক্তি। হুংকার দিয়ে ওঠেন রানী, না! সেটা সম্ভব নয় ; তোমাকে কিছুদিন আমাদের দলের হয়ে কাজ করে আগে আমাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। উপায়ান্তর না দেখে সবিনয় তাতেই রাজি হয়ে যান।

সবিনয়ের ওপর দায়িত্ব পড়ে ধনী পরিবারের বাচ্চাদের কিডন্যাপ করে নিয়ে আসার এবং বাচ্চাদের মুক্তির বিনিময়ে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায় করার; কিন্তু পুলিশকে জানালেই, বাচ্চা খুন! এইভাবেই খুন হয়ে গেছে চার-পাঁচটা বাচ্চা। মর্মান্তিক সেসব দৃশ্য! সবিনয়বাবু এসব সহ্য করতে পারেন না। আর মাধুরী লোহার গারদের অন্ধকূপে বসে ভাবে, তবে কি সবিনয় তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল?

এরই মধ্যে এক নামকরা পুলিশ অফিসারের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ এল রানীসাহেবার কাছে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবেন দেবী—মাথায় জটা, গলায় রুদ্রাক্ষ, পরনে লাল গরদের শাড়ি —যেন আধ্যাত্মিক জগতের প্রাণপ্রতিমা! সঙ্গে চলেছে গেরুয়া বসন পরিহিত দেবীর মহিলা পার্ষদের দল, সঙ্গে সবিনয় মল্লিক। সবিনয়েরও বেশভূষার পরিবর্তন করতে হয়েছে, দেবীর পার্শ্বচর বলে কথা! পুলিশ অফিসারের বাড়ির অনুষ্ঠানে সেদিন নিমন্ত্রিত সমাজের বহু গণ্যমান্য লোক, বড় বড় পুলিশ অফিসার, হাজির দুঁদে গোয়েন্দা

অফিসার আশ্চর্যও। 'অগ্নিহোত্রী দেবী' এসে পৌঁছনো মাত্রই শুরু হলো মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল বাড়ির মেয়েরা, চন্দন দিয়ে বরণ করে বিশেষ আসনে নিয়ে বসান হলো দেবীকে। একে একে দেবীর পার্ষদদের জায়গা হলো দেবীর পাশে। আমন্ত্রিতদের মধ্যে সবিনয় অনেককেই চেনে, তারা কিন্তু বেশভূষার পরিবর্তনে সবিনয়কে চিনতেও পারল না। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড বাল্যবন্ধু আশ্চর্যও সবিনয়কে একদম চিনতে পারল না!

সবিনয় বাথরুমে যাওয়ার নাম করে সংক্ষেপে সব ঘটনা জানিয়ে একটা ছোট্ট চিঠি লেখে আশ্চর্যকে দেওয়ার জন্য, তারপর সবার অলক্ষে ভিড়ের মাঝে চিঠিটা আশ্চর্যর পকেটে ঢুকিয়ে দেয়।

এদিকে প্রায় বছরখানেক হয়ে গেছে, সবিনয়-মাধুরী এখনও বন্দী। মাধুরীর ছেলে হয়েছে। নেপালি স্বামী-স্ত্রী একথা কাউকে জানতে না দিয়ে বাচ্চাটিকে তাদের কাছে রেখেই মানুষ করতে থাকে। প্রায় দশ বছর নেপালি দম্পতি এখানে আছে, সুতরাং ওদের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি, ওদের এখন আর গুহার মধ্যে থাকতে হয় না, ওদের জন্য আলাদা ঘর।

বাড়িতে ফিরে এসে আশ্চর্য সবিনয়ের চিঠিটা পড়ে। সিদ্ধান্ত নিয়ে দেরি হয় না—যা করার, করতে হবে খুব গোপনে ; কারণ—অফিসের বস্‌কে জানালেই তার মাধ্যমেই দেবীর কাছে পৌঁছে যাবে সব খবর, তিন যে দেবীর পরম ভক্ত। —এতে বিপদ সবিনয়ের। অফিস থেকে দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে ফেলল আশ্চর্য। সোজা চলে গেল দেবীর আশ্রমে একজন ভক্ত হিসাবে। দেবী তখন কৃপা করে ভক্তদের দর্শন দিচ্ছেন, আশ্চর্য বসে বসে লক্ষ করল সব কিছু। ভক্ত-সমাগম শেষ হয়ে যাওয়ার পর আশ্চর্য এগিয়ে গেল দেবীর কাছে, নমস্কার করল সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে ; দেবীকে প্রশ্ন করলাম, আপনি এভাবে সবার মধ্যে, সেবার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন, একটা অনাথ আশ্রম করে কিছু অনাথ বাচ্চাকে মানুষ করছেন না কেন? রানীসাহেবা কিন্তু বুঝতেও পারলেন না আশ্চর্যর আসল উদ্দেশ্য, ফাঁদে পা দিয়ে ফেললেন তিনি, বললেন, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু দায়িত্ব নেবে কে? আশ্চর্য জানাল, যদি আপনি রাজি থাকেন মা, তাহলে রোজ সকালে ঘণ্টা দুই আমি বাচ্চাদের পড়ানোর দায়িত্ব নিতে পারি। দেবী তো এককথায় রাজি। কিন্তু সবিনয় দেবীর সামনে আশ্চর্যকে না চেনার ভান করে তীব্র আপত্তি জানায়, অনাথ আশ্রমে বাচ্চাদের মানুষ করতে

গেলে যে টাকার দরকার —সেটা আসবে কোথা থেকে! হুংকার দিয়ে ওঠেন রানীসাহেবা এটা আমার ব্যাপার, আমি চাই না অন্য কেউ এখানে নাক গলাক —অনাথ আশ্রম হবে, হ্যাঁ এটাই আমার শেষ কথা ; কাল থেকেই খোঁজ লাগাও অনাথ বাচ্চাদের।

পরের দিনই রাস্তা থেকে তুলে আনা হলো কিছু ফুটপাথবাসী বাচ্চাদের। তাদের জন্য কিনে আনা হলো নতুন জামা, প্যান্ট, স্লেট-পেনসিল, ছড়ার বই, আদর্শলিপি ইত্যাদি। ক্লাস করানোর জন্য জায়গার সন্ধান চলল গুহার ভিতর। সবিনয়ের ওপর ভার পড়ল আশ্চর্যর পছন্দমত জায়গা ঠিক করে দেওয়ার। জায়গা দেখার নাম করে আশ্চর্য ঘুরে ঘুরে গুহার ভিতরটা পুরোপুরি দেখে নিল, দেখা মিলল মাধুরীরও, সে তখন লোহার গারদে বন্দী। চোখের কোণে কালি পড়েছে, চুলগুলো উড়ছে অশান্তভাবে, সবিনয়ের সঙ্গে হঠাৎ এইভাবে দেখা হয়ে যাবে মাধুরী ভাবতেও পারেনি। দীর্ঘদিন পর স্বামীর দেখা পেয়ে মাধুরী গারদের ভিতর থেকে চিৎকার করে ওঠে, আমাকে এখান থেকে রেহাই দাও নাহলে আমি আত্মহত্যা করব। সবিনয় ইশারায় তাকে আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে বলে। স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখে আশ্চর্য মনে মনে খুবই দুঃখ পায়।

ঘুরতে ঘুরতে আশ্চর্যর চোখে পড়ে একটা ছোট ঘর, লোহার দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। সবিনয় ফিসফিস করে আশ্চর্যকে জানায় ঘরটার বিবরণ: ঘরটা বাথরুমের মতো করে বানানো, যে সব বাচ্চাদের খুন করা হয় মুক্তিপণ না পেয়ে তাদের জন্য ঘরের মধ্যে তৈরি করা আছে একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি ; এই বৈদ্যুতিক চুল্লিতেই জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হয় বাচ্চাদের, প্রমাণ লোপাটের জন্য ছাইগুলো গোপন সুড়ঙ্গ মারফত ময়লা-ড্রেনের মধ্য দিয়ে আদিগঙ্গার জলে—কেউ টেরও পায় না। সবকিছু দেখা শেষ করে আশ্চর্য গুহার ভিতর একটা জায়গা ঠিক করে ফেলল ; বাচ্চাদের ক্লাস শুরু হলো পরের দিন থেকে।

একদিন এইভাবেই 'অনাথ শিশুদের ক্লাস চলছে' আশ্চর্য হঠাৎই লক্ষ করল একটি নতুন বাচ্চাকে, বাচ্চটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আশ্চর্য তাকে জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে তোমার? তুমি কাঁদছ কেন? বাচ্চাটি কাঁদতেই থাকে। আশ্চর্য ওকে কাছে টেনে নেয় ; ভালোবাসার আশ্রয় পেয়ে বাচ্চাটি

বলে ওঠে, আমি মার কাছে যাব, আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে, মা কোথায় জানি না, আমাকে গুণ্ডারা জোর করে ধরে এনেছে। বাচ্চাটি যখন এসব কথা বলছে পিছনেই দাঁড়িয়েছিল রানার নিযুক্ত একজন পাহারাদার, সে সঙ্গে সঙ্গে 'রানী'কে সব ঘটনা জানায়। তখন ডাক পড়ে আশ্চর্যর। কারণ আশ্চর্য যে গোয়েন্দা অফিসার, মক্ষীরাণী ততক্ষণে তা জেনে গেছল।

আশ্চর্য দেবীর কাছে আসতেই হুংকার দিয়ে ওঠেন দেবী, আজ থেকে আপনি আর এখানে আসার চেষ্টা করবেন না, আপনার জানা উচিত আপনাদের ওপরতলার বড়কর্তাদের সঙ্গে আমার যেরকম যোগাযোগ আছে তাতে যেকোনো সময়ে আপনার মতো অফিসারকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলা আমার কাছে নস্যি ; আগুন নিয়ে খেলার চেষ্টা করবেন না, যা দেখেছেন, যা শুনেছেন বাইরে যদি ফাঁস করার চেষ্টা করেন তাহলে আপনার জীবন এই অগ্নিহোত্রীর হাতে বুঝলেন, যান এখান থেকে এই মুহূর্তে চলে যান।

বেরিয়ে আসে আশ্চর্য গুহার ভিতর থেকে, দেবীর সামনে সবিনয়ের সঙ্গে লোক-দেখানো উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ও হয় তার। আর হয়ত এজন্যই সবিনয়ের ওপরই ভার পড়ে আশ্চর্যকে গুহা থেকে বের করে দেওয়ার। আসার সময় ইঙ্গিতে, আশ্চর্য সবিনয়কে ভার দিয়ে আসে নতুন বাচ্চাটিকে বাঁচানোর। আশ্চর্যকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসতেই সবিনয়ের ওপর যথারীতি দেবীর আদেশ হয় বাচ্চাটিকে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে পুড়িয়ে মারার জন্য। মন থেকে এই অন্যায় সবিনয় কোনোদিনই মানতে পারেনি, আজও পারে না ; কিন্তু সেকথা দেবীকে বুঝতে না দিয়ে দেবীকে বলে, এখন অন্য বাচ্চারা সবাই জেগে আছে ওদের মধ্যে থেকে একজনকে আনতে গেলে সবাই মিলে চিৎকার শুরু করবে। তার চেয়ে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে ঘুমন্ত অবস্থায় বাচ্চাটিকে সরিয়ে দেওয়াই ভালো। দেবীর কাছে যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য হয়। তিনি নিজের ঘরে চলে যান সবিনয়কে দায়িত্ব দিয়ে।

পর মুহূর্ত থেকে সবিনয় পুরোপুরি সক্রিয় হয়ে ওঠে—অনেক হয়েছে, আর নয়, যা করার আজ রাতেই করে ফেলতে হবে হয় এসপার না হয় ওসপার। দীর্ঘদিন গুহায় থাকার সুবাদে সবিনয়ের ততদিন জানা হয়ে গেছে এখানকার বাসিন্দাদের মানসিকতা, তাদের মনের জ্বালা। ব্যতিক্রম শুধু দেবীর দুই বিশ্বস্ত পাহারাদার। খুব তাড়াতাড়িই সবিনয় আজ সব কাজ করতে থাকে।

নেপালি স্বামী-স্ত্রীকে দিয়ে তৈরি করায় এক বিশেষ ধরনের সিদ্ধি। সেই সিদ্ধি খাওয়ানো হয় দেবীর দুই পাহারাদারকে আর ওদের দুজনকে দেখিয়ে নকল সিদ্ধি খান বাকি সবাই। আস্তে আস্তে নেশা জমে, ঘুমিয়ে পড়েন দেবীর দুই পাহারাদার। আর দেরি করা চলে না ; চরম মুহূর্তের অপেক্ষায় সকলেই টান টান। গুহার ভিতর থেকে সবিনয় শুনতে পান একটা গাড়ির হর্ন।

সময় আসন্ন। খুব তাড়াতাড়ি দেবীর দুই পাহারাদারের হাত, পা, মুখ বেঁধে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় বৈদ্যুতিক চুল্লির ঘরটিতে। ওদের দুজনের বন্দুক দুটো সরিয়ে ফেলা হয়। দেরী তখন নিশ্চিন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এবার শুরু হয় চূড়ান্ত অপারেশন। প্রথমেই মুক্ত করা হয় মাধুরীকে। সবিনয়, মাধুরী, নিজের বাচ্চা এবং সেই নতুন বাচ্চাটিকে নিয়ে বেরিয়ে আসে গুহার বাইরে। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা শাদা অ্যাম্বাসাডার —ওদের দেখেই গাড়ির দরজাটা খুলে যায়, গাড়ি থেকে নেমে আসে আশ্চর্য। তারপর সেই গাড়িতেই মাধুরী এবং বাচ্চা দুটোকে রওনা করিয়ে দেওয়া হয় এক পরিচিত বন্ধুর বাড়ির উদ্দেশে।

এবার বাকি সবার বেরিয়ে আসার পালা। একে একে বেরিয়ে আসে নেপালি স্বামী-স্ত্রী, অন্যান্য সমস্ত বাচ্চা, সবিনয় এবং বাকি সবাই ; গুহার ভিতর তখন দেবী ঘুমোচ্ছেন আর দুই পাহারাদার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অন্য ঘরে আটক। মুক্তির আনন্দে বাইরে সব লোক তখন বিভোর। কিন্তু এখনও আসল কাজ বাকি। সম্পূর্ণ কালো পোশাক পরা আশ্চর্য সবিনয়কে সঙ্গে নিয়ে শেষবারের জন্য গুহার মধ্যে ঢোকে। একটা ছোট্ট প্যাকেট রেখে ওরা দুজনেই বেরিয়ে আসে গুহার ভিতর থেকে।

ততক্ষণে মাধুরীদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছে সেই শাদা অ্যাম্বাসাডার। এক এক করে সব বন্দিদের এইভাবে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এবার শেষ অধ্যায়। আশ্চর্য ও সবিনয় হাঁটতে হাঁটতে পিছিয়ে আসে গুহা থেকে মাইলখানেক দূরে। এরপরই একটা বিকট শব্দ। এবার সব শেষ ; গুহা ভস্মীভূত —দেবির দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, পাহারাদার দুজন মৃত ; নিষ্ঠুর পৈশাচিকতার একটা অধ্যায় সমাপ্ত হয়। পরম শান্তিতে আশ্চর্য ও সবিনয় করে করমর্দন।

পরের দিন প্রভাতী সংবাদপত্রে প্রথম পাতার 'লিড নিউজ' —বিশিষ্ট সমাজসেবিকা অগ্নিহোত্রী দেবী প্রচণ্ড বিস্ফোরণে নিহত! সারা কাগজ জুড়ে

সেদিন দেবীর স্তুতি, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ছবি, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শোক, সরকার পক্ষের ঘোষণা—'উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হবে'। খুনি কে?

ডাক পড়ল সব গোয়েন্দা অফিসারদের, হাজির আশ্চর্যও, নিয়ে আসা হলো পুলিশ কুকুর। বিস্ফোরণ-স্থলে হাজির পুলিশের সব রথী-মহারথী, উপস্থিত দেবী-ভক্ত পুলিশের সেই উঁচু অফিসার তথা আশ্চর্যর বস্। শোকে তিনি তখন প্রায় বাকরুদ্ধ। পুলিশ-কুকুর কিন্তু গন্ধ শুঁকে শুঁকে খালি আশ্চর্যর আশেপাশে ঘুরতে থাকে। অবাক হয়ে যান সেখানে অন্যান্য পুলিশ অফিসার-কর্মীরা। দেবী-ভক্ত সেই অফিসার ক্ষিপ্ত হয়ে আদেশ দেন, 'অ্যারেস্ট হিম্।'

এদিকে সবিনয় মাধুরীর কাছে ফিরে গেলেও তার বার বারই মনে পড়ছিল আশ্চর্য'র কথা। প্রশাসনের ওপর মহলের সঙ্গে দেবীর ঘনিষ্ঠতার কথা সবচেয়ে বেশি জানত সে-ই। সবিনয়ের আশঙ্কা হচ্ছিল হয়ত আশ্চর্য আজ বড় কোনো বিপদের সম্মুখীন। তদন্ত ঠিকমত হলে আশ্চর্য ধরা পড়বেই। হয়ত তার ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যাবে! দুর্দিনের বন্ধুকে বাঁচানোর তাগিদটা খুব বেশি করে অনুভব করতে থাকে সবিনয়। শেষ পর্যন্ত সব ঘটনা একটা কাগজে সংক্ষেপে লিখে নিয়ে, বাচ্চাটিকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ে আশ্চর্য'র বাড়ির উদ্দেশে।

বাচ্চাটির কাছ থেকে পাওয়া কাগজটা পড়ে বন্যা, স্নেহা দুজনেই সবকিছু জানতে পারে। কান্নায় ভেঙে পড়ে বন্যা ; স্নেহা উঠে দাঁড়ায়, বন্যাকে বলে, কাঁদিস না বন্যা, এটা কান্নার সময় নয়, মাকে কিছু বলার দরকার নেই, আয় আমার সাথে। এই বলে বাচ্চাটির হাত ধরে বেরিয়ে আসে স্নেহা, পিছন পিছন বন্যা। বাইরে বেরিয়ে আসতেই বাচ্চাটি 'বাবা' বলে একজনকে দেখিয়ে দেয়, বুঝতে অসুবিধা হয় না —ইনিই সবিনয়বাবু।

স্নেহার সঙ্গে সামান্য কথা হয় সবিনয়বাবুর। বন্যার গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে স্নেহা বলে, তুই থাক মায়ের কাছে, তোকে কথা দিয়ে যাচ্ছি আমি জীবিত থাকতে আশ্চর্যর কোনো ক্ষতি হতে দেব না, চিন্তা করিস না, শুধু ঈশ্বরকে ডাক ; যে এত মানুষকে মুক্তির আলো দেখিয়েছে তাকে মুক্তির আলো ঈশ্বরই দেখাবে —একটু ধৈর্য ধরে থাক আমি দরকারে তোকে ফোন করে ডেকে নেব।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে স্নেহা প্রথমে যায় আশ্চর্য'র অফিসে, পেছনে স্নেহাকে

অনুসরণ করতে থাকে সবিনয়। আশ্চর্য'র অফিসে গিয়ে জানা যায় —আশ্চর্যকে পুলিশের সদর দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিজেকে আশ্চর্যর বোন হিসাবে পরিচয় দিয়ে '—মা মৃত্যুশয্যায়', এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অনেক কাকুতি-মিনতি করে স্নেহা পুলিশের সদর দফতরে গিয়ে পৌঁছয়।

কিন্তু পুলিশের সদর দফতরে গিয়ে স্নেহা আশ্চর্য সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না —কোথায় তাকে রাখা হয়েছে, কোথায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারে না সে। পুরো জায়গাটাই তার কাছে একটা গোলকধাঁধাঁ মনে হয়। অগত্যা একটা বেঞ্চে স্নেহা চুপ করে বসে। হঠাৎই কানে আসে স্নেহার, দুজন কনস্টেবলের কথোপকথন ; খৈনি টিপতে টিপতে একজন আরেকজনকে বলছেন, আরে ভাই, আশ্চর্য'র মতো পুলিশ অফিসারকেও চাবুক মারছেন বড়কর্তা, কিন্তু আশ্চর্য তো মিথ্যে কথা বলার ছেলে নয় অথচ ওর কোনো কথাই তো বড়কর্তা শুনতে চাইছেন না ; কোনো সাক্ষী কি নেই? ওকে তো মনে হচ্ছে মেরেই ফেলবে। স্নেহা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে বেরিয়ে আসে, বাইরে দাঁড়ান সবিনয়কে অনুরোধ করে, আশ্চর্যর জন্য যারা মুক্তির আলো দেখেছে, তাদের সবাইকে একে একে এখান নিয়ে আসতে ; সব বাচ্চাগুলোকেও এখানে নিয়ে আসার জন্য সবিনয়কে অনুরোধ করে স্নেহা আবার ভিতরে এসে বসে। আশ্চর্যর ওপর তখন চলছে অকথ্য নির্যাতন।

কেটে যায় প্রায় আধঘণ্টা। অধৈর্য হয়ে স্নেহা বারবার হাতঘড়িতে সময় দেখতে থাকে। এক একটা সেকেন্ড তার কাছে এক-এক ঘণ্টা মনে হয়। অথচ সে ভিতরেও ঢুকতে পারছে না, মনের অবস্থা তখন অসহনীয়, বারবারই মনে পড়ছে বন্যার কথা, বন্যাকে 'সে বড় মুখ করে কথা দিয়েছে, পারবে তো সেই কথা রাখতে? এই সব হাজারো ভাবনা-চিন্তার চাপান-উতোরের মাঝখানেই হইহই করে এসে সবিনয় সঙ্গে স্ত্রী মাধুরী, নেপালি স্বামী-স্ত্রী এবং এক-দল বাচ্চা এসে পড়ে। সদলবলে স্নেহা ঢুকে পড়ে পুলিশের বড়কর্তার ঘরে, আশ্চর্য তখন প্রায় আধ-মরা! এরই মধ্যে পৌঁছে যায় বন্যাও, আশ্চর্যর মাথাটাকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আশ্চর্যর মাথায় হাত বোলাতে থাকে।

কিন্তু দেবী-ভক্ত বড়কর্তা তখন যেন ক্ষেপে উঠেছেন, অন্যান্য পুলিশ অফিসার কর্মীরাই বড়কর্তার এহেন উন্মত্ত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বড়কর্তার ঘরে

সবাইকে ঢোকার পথ করে দেন। তারা সবাই চাইছেন আশ্চর্য'র মতো নির্ভীক এবং সৎ আদর্শবান পুলিশ অফিসারের মুক্তি। সবাই সাহায্যের হাত বাড়াতে প্রস্তুত হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন। বাচ্চারা ততক্ষণে সবাই মিলে ঘিরে ধরেছে বড়কর্তাকে, ওরা বলে চলেছে, যে আমাদের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে মারার আগে আমাদের মারুন, যত পারেন মারুন। সেই কথা বলার ফাঁকে স্নেহা কেড়ে নেয় বড়কর্তার হাতের উদ্যত চাবুক। পাগলের মতো বড়কর্তা বার করেন তাঁর সার্ভিস রিভলভার —লক্ষ 'আশ্চর্যর' মাথা। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় পলকে কাজ করে যায় স্নেহার, এক ঝটকায় বন্যাকে সরিয়ে দিয়ে আশ্চর্যকে আড়াল করে দাঁড়ায় স্নেহা। তারপর—

রিভলভার থেকে ছুটে আসা পরপর দুটো গুলি স্নেহার কপাল ফুটো করে বেরিয়ে যায়। লুটিয়ে পড়ে স্নেহা। তৃতীয় গুলিটি চালানোর আগেই বড়কর্তাকে পেছনের দিক থেকে জাপটে ধরে সেই নেপালি পাহারাদার রিভলভার-সুদ্ধ বড়কর্তার হাতটি ঘুরিয়ে দেয় খোদ বড়কর্তার দিকেই —প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয় গুলিটি বড়কর্তার বুক ভেদ করে বেরিয়ে যায় ঘটনাস্থলেই। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্নেহাকে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয় জরুরি-ভিত্তিতে সেখানে স্নেহার অপারেশন হয়, আশ্চর্য, সবিনয় রক্ত দেন অপারেশনের টেবিলে কেটে যায় তিনঘণ্টা। ডাক্তার জানান, ৭২ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার আগে কিছু বলা অসম্ভব।

খবর দেওয়া হয় স্নেহার নিজের মা, সান্ত্বনা দেবী এবং আশ্চর্যকে। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসেন ওঁরা। স্নেহার শয্যার পাশে দাঁড়ান। প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ঘোরের ভেতর স্নেহা তখন অস্ফুটে বলে চলেছে, 'মা, মাগো'। সান্ত্বনা দেবী কাঁদতে কাঁদতে মেয়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকেন, কিন্তু স্নেহার পক্ষে তা বোঝাও তখন অসম্ভব। আশ্চর্য'র মা চোখের জল মুছতে মুছতে স্নেহার মাথায় হাত রেখে বলতে থাকেন, মা, তুই আমার ছেলের জীবন বাঁচিয়ে আমার সত্যিকারের মেয়ের কাজ করলি মা ; ভগবান আমার জীবন নিয়ে তোকে বাঁচিয়ে দিক। স্নেহার কানে এসব কোনো কথাই ঢোকে না। ইতিমধ্যে নার্সিংহোমে এসে হাজির প্রশাসনের বড়কর্তারা। স্নেহার দুপাশে দাঁড়িয়ে বন্যা ও আশ্চর্য, অন্যান্য সবাই ঘরের মধ্যে সবার দৃষ্টি স্নেহার দিকে নিবদ্ধ।

কাঁপা কাঁপা দুটো হাত দিয়ে স্নেহা প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতেই বন্যা আর আশ্চর্য'র দুটো হাত এক করে মিলিয়ে দেয়, আশ্চর্যকে সম্বোধন করে খুব আস্তে আস্তে ক্লান্ত গলায় বলে ওঠে, দাদা, বন্যাকে দেখো, আর এই অনাথ বাচ্চাদের জন্য একটা আশ্রম করো— আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল এরকমই একটা 'দেবালয়' করার, যেখানে হবে প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাধনা ; তোমাদের কাছে অনুরোধ একটাই আশ্রমটার নাম রেখ— 'পল্লবী', আমি বেঁচে থাকব ওই আশ্রমের মধ্যেই... বলতে বলতেই স্নেহার দেহটা স্থির হয়ে আসে, মাথাটা ঢলে পড়ে একদিকে, উপস্থিত সবার উচ্চকিত কান্নার আওয়াজ ওঠে— ইহলোক থেকে চিরবিদায় নেয় স্নেহা, মৃত্যুকে বরণ করে সানন্দে, কৃতজ্ঞতার ডালায় নিজেকে আহুতি দিয়ে।

জীবন্ত পল্লবীর জীবনযাত্রা শেষ হয় ; শুরু হয় 'পল্লবী অনাথ আশ্রম'— পল্লবী ওরফে স্নেহার স্মৃতিতে, স্নেহার মর্মরমূর্তিকে সামনে রেখে। বন্যা এবং আশ্চর্য নিজদের কাঁধে তুলে নেয় আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব। অনাথ বাচ্চারা স্থান পায় সেই অনাথ আশ্রমে আর স্নেহার নামে এক কৃষ্ণচূড়া গাছ পোঁতে বাচ্চারা। সূর্যোদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পল্লবী অনাথ আশ্রমের বাচ্চারা সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের সামনে দাঁড়িয়ে স্নেহার উদ্দেশে তার স্মরণে রোজ প্রার্থনা সঙ্গীত গায়। স্নেহার অতি প্রিয় গান পল্লবীর সঙ্গে পল্লবিত হয়, শিশুকণ্ঠে— আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা। স্নেহার স্নেহ পল্লবীতে রূপান্তরিত। পল্লবীর জীবন ধন্য। সব দুঃখ ও সব মানসিক যন্ত্রণার অবসান। আজ সে মুক্ত, বাধাহীন গণ্ডিহীন, কেউ আর তাকে ছুঁতে পারবে না। সে আজ আর বোঝা নয়। কেউ আর আজ তাকে অবিশ্বাস করবে না। এটাই তো চেয়েছিল স্নেহা। চাওয়া এবং পাওয়ার মাঝখানে পল্লবী পেল নতুন সম্মান। সে সম্মান সাহসিকতার কৃতজ্ঞতার মানবিকতার ও বন্ধুত্বের।

পথভোলা

আমাদের 'জন্মমরণ' ও ভবিষ্যৎ এক অদৃশ্য হাতের অদৃশ্য সুতোয় গাঁথা নদী যেমন সাগরপানে তার গতিতে প্রাণের সঞ্চার করে। সেরকম মানবজীবনেও স্বপ্ন অনেকেই দেখে। তবে সার্থক স্বপ্ন নিয়ে আসে এক সার্থকতার কলেবর আর ব্যর্থ স্বপ্ন হৃদয়ে বাজে সর্বদা হতাশগ্রস্ত এক বিষাদময় সুর।

জীবনটা কী তা জানবার পূর্বেই পথভোলা নামে এক বালক যেদিন তার মোটামুটি বোঝবার ক্ষমতা হয়েছে, নিজেকে তখন সে দেখে সে পড়ে আছে এক মন্দির প্রাঙ্গণে। দর্শনার্থীরা কেউ বা দয়া করে তার সামনে কিছু পয়সা রেখে যাচ্ছে অথবা কোনো প্রসাদ। 'পথভোলা' নিজেকে আবিষ্কার করে যখন মন্দির প্রাঙ্গণে, তখন তার মনের মধ্যে একটার পর একটা প্রশ্নের ঝড় বয়ে যায়। সে জানেনা তার পিতৃপরিচয় অথবা মাতৃপরিচয়। কীভাবে সে এখানে এলো, কি তার ভবিতব্য, এটাই কী তার বেঁচে থাকার পান্থশালা? ভাবতে ভাবতে লজ্জায় ও ঘৃণায় সে শিহরিত হয়ে ওঠে। সে সব ফেলে এক দৌড়ে চলে যায় নারায়ণের মূর্তির কাছে। মাথা ঠুকে কাঁদে আর বলে, ঠাকুর আমাকে আলো দেখাও, আমাকে বাঁচার পথ করে দাও।

মাঝে মাঝে তার কানে ভেসে আসে দূর থেকে এক বাউলের কণ্ঠস্বর—'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ, আমার মন ভোলায় রে'। বাউলের একতারা বাজিয়ে গান, তার হৃদয়ে আনে অনেকের ঝরনাধারার মতো এক প্লাবন। কিন্তু সে বুঝতে পারে না কী করবে সে, হঠাৎ তার মনের মাঝারে কেউ যেন তাকে বলে—'চল, চল সম্মুখ পানে

যেথায় নেই কোনো নাম
নব্যলব্ধ সকাল আনবে নূতন পরিচয়
নূতন জগত জানতে গেলে যেখানে পেয়েছে লয়
সেখানেই তোমাকে করে নিতে হবে স্থান
অন্ধকার থেকে আলো জোগাবে নূতন সন্ধান।'

তার মনকে আলোড়িত করে দেয় নতুন ভাবে বাঁচার সন্ধান। এরই মাঝারে প্রাণের সঞ্চার হয়। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বাইরের জগৎ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সে হঠাৎ একদিন গানের সুরে আত্মহারা হয়ে যায় সেই বাউলের কাছে। বাউলের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বাউলকে কাকুতি-মিনতি করে সে, আমাকে গান শেখাবে? আমাকে তোমার সাথী করবে? আমি তোমার সব কাজ করে দেব। শুধু আমাকে বাইরের জগতের আলো দেখতে দাও। বাউল একটা বাচ্চা ছেলের কাকুতি-মিনতিকে উপেক্ষা করতে পারে না। তার প্রাণের ঝংকারে একটা শিশুমনের ধাক্কা তাকে আবেগময় করে তোলে। সে বলে, তোমার নাম কী? ও বলে, জানি না আমার নাম কী। সবাই আমাকে মন্দির প্রাঙ্গণে 'পথভোলা' বলে ডাকে। বল তো সত্যিই কি আমি 'পথভোলা?—আমার কেন কোনো পরিচয় নেই? এর জন্য কি দায়ী আমি? বাউল উপলব্ধি করে তার সূক্ষ্ম মনের যাতনা। বাউল বলে 'পথভোলা'—তো দারুণ নাম, তুমি দুঃখ করছো কেন? তুমি কী জানো আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন যে, 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি'—পথভোলা অবাক হয়ে ভাবে তাহলে তার নাম সুরের তালে ও ছন্দে সংযোজিত ; সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। সে বাউলকে বলে, আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাবে গো? আমি তোমার পরিচয়েই আমার পরিচয় স্বীকার করে নেবো, যদি তুমি আমাকে সে অধিকার দাও।

বাউল নিজেও নিঃসন্তান, কয়েকবছর আগে তার আপনজন স্ত্রীও মারা গেছে। বাড়িতে কখনো সে থাকে। আবার কখনো এখানে সেখানে ঘুরে বেরিয়ে সময় কাটিয়ে দেয়। তাছাড়া বয়সও হচ্ছে। একজন থাকলে তো ভালোই হয়। বাউল পথভোলাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলে। অনেক রাস্তা চলার পর বাউল ও পথভোলা একসময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এক গাছের তলায়। খিদের ভীষণ জ্বালায় দুজনেরই ঘুম ভেঙে যায়। বাউলের সঙ্গেও

খাবার কিছু নেই। আর 'পথভোলা'—তার ওই নাম ছাড়া আর কিছুই নেই। বাউল পথভোলাকে জিজ্ঞেস করে, কী রে খিদে পেয়েছে? পথভোলা বলে হ্যাঁ।

কিন্তু কোথায় খাবার পাবে তারা? তাই অগত্যা দুজনে সামনেই এক পুকুর ছিল সেই পুকুরের জল খেয়ে পেট ভরাবার চেষ্টা করে। তারপর ক্ষুধায় ক্লান্তিতে অবসন্ন দুজন আবার গাছের তলায় এসে বসে পড়ে। পথভোলা বলে, একটা গান গাও না বাবা—'বাবা' ডাক শুনে বাউল কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে যায়। একদিকে তার হৃদয়ের শূন্যস্থানে 'বাবা' শব্দ আছড়ে পড়ে। অন্যদিকে পথভোলার করুণ মুখে, তার খিদে পেয়েছে অথচ বাবা হয়ে সন্তানের মুখে দুটো অন্ন না দিতে পারাটা যে কতটা দুঃখের সেদিন বাউল তা মনে মনে অনুভব করতে পারেন। আর ঈশ্বরের উদ্দেশে তাঁর এই মর্মবেদনা পৌঁছে দেবার জন্য নিজের ক্লান্তি খিদে সব ভুলে গিয়ে একতারাটা হাতে তুলে নিয়ে বাউল গান ধরল আবার সেই গাছের তলায় এসে—'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো'—তাঁর গান শুনে আসে পাশে বাচ্চা থেকে বুড়ো অনেকে জড়ো হয়ে গেল। কেউবা তার গান শুনে থালায় করে মুড়ি শশা, নারকেল কেউবা নিয়ে এলেন নারকেলের নাড়ু।পথভোলা অবাক হয়ে দেখছে গ্রামের মানুষের আন্তরিকতা আর ভাবছে যার কেউ নেই তার ঈশ্বর আছেন। আর ঈশ্বর তো মানুষের মধ্যেই থাকেন। আর মানুষের মাঝারেই আশ্রয়ের সন্ধান দেন। গান শেষ হলো। গ্রামের সহজ সরল প্রাণবন্ত মানুষেরা বাউলকে আর পথভোলাকে—ঘিরে বসে তাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। খিদেয় অধীর তখন বাউল এবং পথভোলা—নারকেলের নাড়ুগুলো পরে খাবে বলে থলেতে সঞ্চয় করে রেখে মুড়ি শশা ও নারকেল দিয়ে তাদের জলপান শুরু করল। ক্ষুধার্ত হৃদয় অতি স্বল্প সময়েই সবটা প্রায় শেষ করে ফেলল। এমন সময় একটা ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে তাদের জন্য দু গ্লাস শরবত করে নিয়ে এসেছে। সে শরবত অমৃতের মতোই পান করে তারা তাদের অন্তরকে যেন শান্ত করল। সেই ফুটফুটে বাচ্চা মেয়েটি, যদিও চেহারায় এক অতি সুন্দর ঝলক কিন্তু গায়ের রঙ কালো বলে তাকে সবাই কোকিলা বলে ডাকে। সেই কোকিলা বাউলকে প্রণাম করে অনুরোধ জানাল বাউলকে যাতে তাদের বাড়িতে বাউল ও পথভোলা দুপুরের আহার গ্রহণ করেন। বাউল

বলল, ঠিক আছে। দুপুর বেলায় বাউল ও পথভোলা অতি তৃপ্তি করে কোকিলাদের বাড়িতে দুপুরের খাওয়া সেরে এবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার বাড়ির দিকে রওনা হলো, কারণ অনেক পথ এখন তাদের পেরতে হবে। কিন্তু কোকিলা সহ গ্রামের সমস্ত লোকেদের অন্তর সেই বাউল এবং পথভোলার মনকে এমনভাবে স্পর্শ করল যা তাদের অন্তরে আন্তরিকতার মালা হয়ে গেঁথে থাকল। বাউলমশাই পথভোলাকে নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়াল। বাউলের বাড়ি যাবার পথ বহুদূর। এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তা, কখনো বা ছোট ছোট খাল বিল পেরিয়ে তারা চলতে থাকে। পথভোলার কিন্তু এই নতুন জগৎ খুবই ভালো লাগে। কখনো পাখির ডাক, কখনো পুকুরে গজিয়ে ওটা পদ্মপাতা কখনো বা ধানের শীয। কখনো বা গ্রামের বধূর জল নিয়ে যাবার পরিবেশ তাকে নতুন কিছু জানার সন্ধানে আকুল করে তোলে। আর একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বাউলমশাইও অনেক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পথভোলা তখন বাউলের কাঁধের ঝুলি আর একতারাটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আপনমনে চলে নতুন বাসার সন্ধানে। বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যায়। চারিদিকে অন্ধকার, পথভোলো ওই চাঁদের আলোর ফাঁকেই দেখতে পায় যে মাটির দেওয়াল আর দরমার বেড়া দেওয়া মাটির বারান্দা সহ ছোট্ট একটা ঘর। বাউল দেশলাই বের করে হ্যারিকেন জ্বালায়। হ্যারিকেনের আলোয় কোনোরকম তারা ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র রেখে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করে। রাতের আহার বলতে মাটির উনুনে কোনো রকম সেদ্ধ ভাতের দুটো বন্দোবস্ত। বাউল আর পথভোলা যেন পরমতৃপ্তিতে তা খেল আকাশের নীচে। শরৎকাল, নীল আকাশ, চারিদিকে শিউলি ফুলের গন্ধ শরৎ যেন শিশির ধৌত নির্মল সৌন্দর্যের প্রাচুর্য নিয়ে আকাশের উজ্বল নক্ষত্রের মধ্যে মাঝে মধ্যেই মিটিমিটি করে পথভোলার দিকে তাকিয়ে হাসছে। কোথার থেকে কোথায় এসব নানারকম চিন্তাভাবনা করে পথভোলা চলে অঘোর ঘুমের মাঝারে। ঘুমোতে ঘুমোতে সে স্বপ্ন দেখে কোকিলা তার জন্য নাড়ু নিয়ে এসেছে। তার ঘুম ভেঙে যায়। তখন সে তাকিয়ে দেখে গভীব রাত। তাই আবার এপাশ ওপাশ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকাল বেলায় পাখির কিচির মিচির আওয়াজ ঘুম ভেঙে যা ঘুম ভেঙে গেলে সে পুকুরে যায় মুখ হাত-পা ধুতে। চারিদিকে যেন সোনালী স্বপ্ন।

নীলদিগন্তের মাঝারে শুভ্র কাশবন। শরতের শিউলিফুল শুভ্র মেঘমালার মতো প্রকৃতিকে করে তুলছে অপূর্ব বর্ণময়। সে আত্মহারা হয়ে যায়। যেন সব কিছুই তার কাছে নতুন স্বাদ নিয়ে এসেছে, সে পুকুর পাড়ে জলের মধ্যে পদ্মপাতা আর জলের কোলাহলে একঝাঁক হাঁস ঘোরাফেরা করতে থাকে। এদিকে 'বাউল' ঘুম থেকে উঠে দেখে তার পাশের বিছানা খালি। পথভোলা তো নেই, তবে কী সে না বলে চলে গেছে, আকুল হয়ে ভাবতে ভাবতে 'পথভোলা-পথভোলা' করে চিৎকার করে ডাকতে থাকে। পথভোলার কর্ণকুহরে গিয়েও প্রবেশ করে বাউলের সে ডাক। পথভোলা দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হয়। বাউল এবার একতারা নিয়ে বেরোবে। কারণ এটাই তার একমাত্র উপার্জনের পথ। পথভোলাও তৈরি হয়ে নেয়। একতারাটা তার হাতে নিয়ে বাউলকে বলে, বাবা আমাকেও তোমার গানে তালিম দাও না। বাউল বলে, তুইও তাহলে আমার পথ ধরবি হতভাগা! তোকে আমি পড়াশুনা শেখাব। জানিস আমাদের গ্রামে কোনো ভালো ডাক্তার নেই। আমার রাস্তা তোর বেছে নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। পথভোলার মন খারাপ। কারণ পড়তে তার ভালো লাগে না। গ্রাম্য প্রকৃতি তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তার জন্য যেন একতারা উন্মুখ হয়ে বসে আছে কিন্তু বাবার, কথা তাই বাবার কথা মেনে তাকে পাঠশালায় ভর্তি হতে হলো।

মাস্টারমশাই পড়ান অ-আ আর পথ ভোলার মন একতারায়। একদিন মাস্টারমশাই বাউলকে ডেকে বলে, শুনুন বাউলমশাই আপনার ছেলে সবসময় উদাস হয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, ওকে ঘরে বন্দী করে না রেখে ওকে ও যা করতে চায় তাই করতে দিন, বাউলমশাই প্রায় অপমানিত হয়ে এসে গুম করে বাড়ির বারান্দায় বসে থাকে, আর একতারাটা বারান্দায় তুলসী গাছতলার সামনে ফেলে রেখে দেয়। পথভোলা পাঠশালা থেকে ফিরে এসেছে তার অত্যন্ত খিদে পেয়েছে, সে বলে, বাবা খিদে পেয়েছে, খাবার নেই কেন? আজ রান্না করোনি। বাউলমশাই কোনো কথা বলেন না, গুম হয়ে বসে থাকে। এদিকে পথভোলাও অভিমানে গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে। বাউলমশাই পথভোলাকে কাঁদতে দেখে বলেন বাবা, আমার বড় আশা আছে রে তোর প্রতি। তুই একদিন অনেক বড় হবি, নাম করবি। কিন্তু আজ তোর মাস্টারমশাই আমাকে ডেকে বললেন যে, তোর দ্বারা পড়াশুনা হবে না। আমি

এখন কী করব?

মুহূর্তের মধ্যে সে বাবার মলিন মুখ আর চোখের জল দেখে বলে উঠল, বাবা আমি কাল থেকে মন দিয়ে পড়াশুনা করব। কিন্তু তুমি আমাকে কাল থেকে গান শেখাবে বল। বাউলমশাই বললেন ঠিক আছে, তুই যদি পরীক্ষায় ভালো ফল করিস তাহলে তোকে আমি একটা ভালো একতারা কিনে দেবো। আর কাল ভোরবেলা থেকে তুই আমার কাছে একঘণ্টা গান শিখবি।

এটাই তো চাইছিলো পথভোলা। একতারা যে তাকে টানছে ওটা পেলে আর সব কিছুতেই সে রাজি, কথামত পরের দিন সকালে শুরু হলো বাবা ও ছেলের একসঙ্গে গান। তারপর খেয়েদেয়ে পাঠশালা।

পথভোলা আজ মন খোলা, একতারা তার মনকে দিয়েছে ভরিয়ে। তাই মাস্টারমশাই পড়াতে গিয়ে লক্ষ করলেন পথভোলা আজ একেবারে অন্যরকম। মন দিয়ে পড়াশুনা শুনছে এবং তার চটপট উত্তরও দিচ্ছে। পথভোলার জেদ চাপে তাকে ভালো ফল পরীক্ষায় করতেই হবে তা না হলে তার বড় সাধের একতারা তো তার ভাগ্যে জুটবে না, বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরবে। সে তার বাবাকে বলে, তুমি যাও না ফলটা জেনে এস, আমি যাব না। আমার ভয় করছে। বাউলমশাই পরীক্ষার ফল আনতে গিয়ে দেখলে পথভোলা প্রথম হয়েছে। বাউলমশাই আনন্দে আটখানা। কিন্তু পথভোলাকে বোকা বানানোর জন্য বাড়িতে এসে চুপ করে বারান্দায় একতারাটা নিয়ে বসল আর গান জুড়ল—চাইনা মাগো রাজা হতে— পথভোলা গান শুনে ভাবল তার ফল নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে তাই অভিমানে তার বাবা এই গান গাইছে। সে তখন মন খারাপ করে গিয়ে পুকুর পাড়ে বসে ভাবছে সে কী করবে প্রায় ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে আছে সে পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে, এমন সময় দেখে বাউলমশাই একটা নতুন একতারা নিয়ে এসে পথভোলাকে দিয়ে বলছে, পথভোলা এটা তোমার পরীক্ষার ফল। পথভোলা নিজস্ব একতারা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। পাড়ার সব বন্ধুদের বলে এই গান শুনবি। সবাই বলে তুই আবার গান গাইতে পারিস নাকি? পথভোলা গেয়ে ওঠে—'এবার তোর— মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী'—বন্ধুরা হাততালি দিয়ে ওঠে।

এই ভাবেই পাঠশালা অতিক্রান্ত হয়ে পথভোলা যায় হাইস্কুলে। হাইস্কুলেও পথভোলা খুব ভালোভাবে বাবার সম্মান রক্ষার্থে পড়াশুনা শুরু করে। গ্রামের

অজানা পথ পেরিয়ে অনেক দূরে হাইস্কুল, পথভোলা সাইকেলে করে যায় হাইস্কুলে পড়াশুনা করতে। যাতায়াতেই প্রায় ২ ঘণ্টা সময় কেটে যায়। তার মধ্যেও সে এখন ভালো গান গায়। আবার জেলার সব মিলিয়ে খেলাধূলা গান ইত্যাদি প্রতিযোগিতা হবে বীরভূম জেলায় এই প্রথম। পথভোলাও গানের সেই প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে। এদিকে যেদিন সেই প্রতিযোগিতা সেই দিন আবার অন্যান্য স্কুল থেকেও ছেলে-মেয়েরাও এসেছে। পথভোলা লক্ষ করে গানের প্রতিযোগিতায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম গানে অংশগ্রহণ করছে সেই কোকিলা যার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল যেদিন সে ও তার বাবা অর্থাৎ বাউলমশাই গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে ক্লান্ত হয়ে কোকিলাদের বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিল।

কোকিলা মধুর সুরে গান গাইতে শুরু করে, 'আমার জীবন পাত্র উছলিয়া মাধুরী করেছো দান'। অপূর্ব গান, কণ্ঠ, সুর সব কিছু মিলিয়ে এক গানের প্রকৃতির বেড়াজালে সবাই উন্মুক্ত হয়ে একাত্ম হয়ে গান শোনে। এবার হাততালিও পায় কোকিলা প্রচুর। গান শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে।

এরপর পথভোলার অংশগ্রহণ। পথভোলা, কোকিলাকে চিনতে পারলেও, কোকিলা কিন্তু পথভোলাকে চিনতে পারে না। কারণ অনেকদিন আগেকার দেখা। পথভোলার সাথী বলতে তার প্রথম জীবনের বাবার দেওয়া সেই একতারাটি। পথভোলা তার দরদ দিয়ে গান গায় আর কোকিলার গানের উত্তরেই প্রায় গান গেয়ে যদিও উভয় উভয়ের মনে একে সুপ্ত ইশারার সন্ধান রাখতে চায়। তাই গানের উত্তরেই কোকিলা তাকে যাতে চিনতে পারে তার ইশারা বহন করেই সে গান ধরে 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি। সন্ধ্যাবেলার চামেলিগো, সকাল বেলার মল্লিকা আমায় চেন কি।'

বসন্তের সৌরভ আর মধুর কণ্ঠের আবেগজড়িত পথভোলার গান সমস্ত শ্রোতাবৃন্দকে যেন ক্ষণিকের জন্য তাদের হৃদয়ে শিহরন জাগিয়ে যায়। কিন্তু যার উদ্দেশে গাওয়া সে কোকিলার হৃদয়ে এ সুর কোনো অতীত জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয় কি? উভয়ে জানে না গানের প্রতিযোগিতার কী ফল হবে। বিচারকমণ্ডলী গানের প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা করে। সমস্ত বিচারের পর এ ফল যেন প্রত্যাশিতই ছিল। গানের প্রতিযোগিতার মেয়েদের মধ্যে প্রথম কোকিলা আর ছেলেদের বিভাগে প্রথম হয়েছে পথভোলা। দুজনেই দুজনের

পুরস্কার নিয়ে যে যার গন্তব্যস্থলের দিকে পাড়ি দেয়। পথভোলার কানে কিন্তু কোকিলার কণ্ঠ দোলা দেয় বারবার। তার ভীষণভাবে মনে পড়তে থাকে সেই ছোটবেলায় ক্ষণিকের দেখা কোকিলার কথা। যাইহোক, দুজনেই লাজুক স্বভাবের তা কেউ কারোর দিকে তাকিয়ে কথা বলার অবকাশ পায় না। আস্তে আস্তে হাইস্কুলে ভালো রেজাল্ট করে পথভোলা। এবার শহরে গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু কলেজে পড়বার মতো আর্থিক সামর্থ্য তার না থাকলেও তার ভালো রেজাল্টের এর জন্য সে কলেজে বিনা খরচায় পড়ার সুযোগ পেয়ে গেল। কিন্তু বাবার যে অনেক বয়েস হয়েছে, তাই গান গেয়ে অর্থ উপার্জন করে সংসার চালাতেও সে প্রায় অক্ষম। তাই একদিকে কলেজে পড়া অন্যদিকে কলেজের হস্টেলে আবাসিক হিসাবে থেকেই সে গানের টিউশান এবং কয়েকজন ছাত্রকে প্রাইভেটে পড়িয়ে যৎসামান্য কিছু হাতখরচা রেখে দিয়ে বাদবাকি প্রতিমাসে একবার করে গ্রামের বাড়িতে এসে বাবার সমস্ত খরচ দিত ও বাবাকে দেখে আসত। বাউলমশাই এখন একদম একা, একতারা ধরে গান গাইতেও তার আর ভালো লাগে না। তার যে একেবারে সময় কাটে না। তবু পথভোলা কবে আসবে এই নিয়ে পথ চেয়ে থাকা। আর ঈশ্বরের নিকট আকুল প্রার্থনা—যদি সবই দিলে তাহলে আমার পথভোলাকে ডাক্তার করে দাও, যাতে আমাদের এই অজ পাড়াগাঁর লোক কমপক্ষে একটু চিকিৎসার আলো দেখতে পায়।

পুজো এসে গেছে। একমাস পথভোলার কলেজ ছুটি। সে আসে গ্রামের বাড়িতে। এসে দেখে বাবা শয্যাগত। জ্বরে প্রায় বেহুঁশ। গ্রামে কোনো ডাক্তার নেই। পথভোলা সাইকেলে চড়ে যায় শহরে ডাক্তার আনতে। ডাক্তারবাবু নারাজ, প্রথমত, অতদূর যেতে পারবেন না আর গেলেও চারগুণ দক্ষিণা দিতে হবে। পথভোলা সঙ্গে সঙ্গে তার হাতঘড়িটা ডাক্তারবাবুকে দিয়ে বলে, চলুন। বাকিটা বাড়িতে দিয়ে দেব। ডাক্তারবাবু যেন ভীষণ বীরত্বের কাজ করেছেন অজানা এক অজ পাড়াগ্রামের দিকে রওনা দিয়ে। যাইহোক দেখলেন বাউলমশাইকে, তার পর তার সব প্রাপ্য বুঝে নিয়ে পথভোলার সঙ্গে ওষুধ দেবার নাম করে নিয়ে গেলেন। গিয়ে ওষুধ দেবার নাম করে এক শিশি লাল জল অর্থাৎ যেন খেলেই সেরে যাবে গোছের ওষুধ হাতে গুঁজে দিলেন,

পথভোলা বাড়িতে ফিরতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেল। তাই ফিরে এসে দেখে জ্বর আরও বেড়েছে বাবার। কোনো হুঁশ নেই। আর ঘরে পথ্য তো দূরের কথা এক ফোঁটা দুধও নেই যে বাবাকে কিছু অন্তত গরম কিছু দেবে। অনেক রাত হয়ে গেছে। কোনো উপায় নেই দেখে সে পাশের বাড়ি থেকে একটু সরষের তেল চেয়ে নিয়ে আসে সেটাকে গরম করে পায়ের তলাতে ঘষতে থাকে। তার বাবার মাথায় জলের পটিও দিতে থাকে। এই ভাবে বাবার সেবা করতে করতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে তা সে নিজেও জানে না। সকাল হতে দেখে বাবার জ্বর কিছুটা কমেছে কিন্তু তার ওঠার ক্ষমতা নেই। শরীর এবং চেহারা একেবারে মলিন হয়ে গেছে। বাবার জন্য পথ্য দরকার, যা পয়সা সে নিয়ে এসেছিল তা একদিনেই ডাক্তারকে দিয়ে শেষ। তাই সে ভাবে কি করে বাবার পথ্য জোগাড় করবে। কোনোরকমে সকালের খাবার আয়োজন করে পথভোলা চিন্তা করে কি করবে। পুজোর সময় শহরাঞ্চলগুলো জমজমাট। একতারাটি তাকে ইশারা করে। সে বাবাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাতে তাকে কেউ চিনতে না পারে সেইজন্য বাবার যে বাউলের পোশাক ছিল সেই পোশাক পরে প্রায় গ্রামের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে শহরের এক মেলাপ্রান্তে এসে দাঁড়ায় এবং শুরু করে একতারা নিয়ে একের পর এক গান।

শ্রোতারা ভিড় জমাতে শুবু করে আর একটা পেতে রাখা গামছায় লোকে যার যা সম্ভব তাই দিয়ে যায় তারা। একের পর এক গেয়ে যায় পথভোলা—'বড় আশা করে এসেছিগো কাছে ডেকে লও', কখনো 'পুরানো সে দিনের কথা' কখনো 'সোহাগ চাঁদ বদনী ধনি নাচোতো দেখি', আবার কখনো 'আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরালো/সকলি ফুরায়ে যায় মা' 'দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে' আবার আবার কখনো 'এই ধিতাং ধিতাং বোলে' মানুষের মন জয় করে পয়সার পুঁটলি বেঁধে রাস্তায় পোশাক পরিবর্তন করে বাবার জন্য পথ্য ও ঘরের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে সে ফিরে আসে। আর ভাবে এই একতারা তাদের সাত দিনের বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। কাজেই আবার সাত দিন বাদে বেরনো যাবে। যাইহোক, বাবা ছেলের সেবায় আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু বাবার একার পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব নয় তাই একটা ছেলেকে বাবার দেখাশোনার জন্য রেখে সে প্রায়ই ছুটির এক মাসটা বাবার যাতে সংসার চালাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেই জন্য বাউলের

পোশাক পরে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে গান গেয়ে অর্থ উপার্জন করে। একদিন সে লাভপুরের একটা জায়গায় গান গাইছে। গান শেষ হবার পরে লক্ষ করে একজন ভদ্রলোক তাকে ইশারাতে ডাকছে এবং সে স্টেজে প্রোগ্রাম করতে রাজি আছে কি না জিজ্ঞেস করে। সে তখন এককথায় রাজি হয়ে যায়। কিন্তু শর্ত দেয় একটা যে বাবা যাতে জানতে না পারে তাই 'পথভোলা' নামে আমি গান গাইব না, আমি গান গাইব 'উদয়ন' নামে আর আমার পড়াশুনা চলার সময় বা পরীক্ষার সময় সময় দিতে পারব না তবে শনি-রবিবার আমার কোনো অসুবিধা নেই। এইভাবে সে স্টেজে গান গেয়েও মানুষের মন জয় করে। পরীক্ষার রেজাল্ট অনুযায়ী হয়ত বাউলমশাই-এর ইচ্ছা ঈশ্বর পূর্ণ করতে চান তাই পথভোলা আশ্চর্যজনকভাবে ডাক্তারিতে সুযোগ পেয়ে গেলো। বাউলমশাই পথভোলাকে বলল পথভোলা এই গ্রামে ডাক্তার হয়ে তুই মানুষের সেবা করবি আর তার নাম দিবি 'সেবায়ন'—আমার গ্রামের গরিব-দুঃখীরা অন্তত চিকিৎসার একটা সুযোগ পাবে।

পথভোলা একদিকে ডাক্তারি পড়ে অন্যদিকে উদয়ন নামের ছদ্মবেশে প্রায় প্রতি সপ্তাহে বাউল সেজে একটা করে গানের অনুষ্ঠান করে আর তাতে যা পায় তাতে তাকে এখন আর প্রাইভেট ট্যুইশান করতে হয় না। এভাবেই তার এবং বাউলমশাই এর সংসার চলে যায়। এদিকে উদয়ন গানের জগতে আসর মাত করল। রেডিওতেও গান গাইবার সুযোগ পায় সে। তাই তার যশ ও খ্যাতি বাড়তে থাকে। কিন্তু কোনো যশ বা খ্যাতি তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। আকর্ষণ তার একটাই ডাক্তার তৈরি হয়ে কবে সে গ্রামের মানুষের সেবা করতে পারবে। এইভাবে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই তার দিন কেটে যায়। ডাক্তারি পরীক্ষা সামনে তাই কিছুদিনের জন্য পথভোলা গান বন্ধ রেখে পড়াশুনায় মন দেয়। মন দিয়ে একাগ্রচিত্তে দিন রাত খেটে তার বাস্তব স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য তার একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় ডাক্তার হবার। সময় চলে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়, তাই একদিন পরীক্ষা চলে আসে। পরীক্ষা হয়ে যায় ভালোভাবে। পরীক্ষা হয়ে যাওয়া মানে নিশ্চিন্ত। এরপর উদয়ন নামে চলে তার বিভিন্ন গানের অনুষ্ঠান এবং নিয়মিত গানের অনুষ্ঠান। বাউল তার ছেলের গর্বে গর্বিত। তাই বয়স হয়ে গেলেও মাঝে মাঝেই গ্রামে সমবয়সীদের সঙ্গে আড্ডা জমায় যে আজ ঈশ্বর কীভাবে তাকে তার নিজের

সন্তান না থাকতেও পথভোলাকে তার ভবিষ্যৎ হিসাবে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিজের সন্তান থাকলেও হয়ত এতটা আন্তরিকতা ও এতখানি আনুগত্য আমি পেতাম কিনা সন্দেহ। তাই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে নানা কথা মাঝে মাঝেই তুলসীতলায় দাঁড়িয়ে সে অহরহ উচ্চারণ করে।

আর পথভোলা যে একদিন বাউলমশাইয়ের কাছে নিকট প্রায় জোর করেই গানের তালিম নিয়েছিল। সেই তার আশ্রয় প্রদীপ তার একান্ত আপনজন তার অতি প্রিয় বাবাকে মাঝে মাঝেই একতারা বাজিয়ে সে গান গেয়ে শোনায়। বাউলমশাই গান এখন গাইতে না পারলেও ছেলের গান তিনি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে আর ভাবেন এত গুণ ছিল পথভোলোর মধ্যে! যদি সে তার আবেদনে সাড়া না দিত তাহলে পথভোলা হয়ত পথভোলা এক পথভ্রান্ত পথিকের মতোই রাস্তায় বা মন্দির প্রাঙ্গণে বসে হয়তো কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে বেড়াত। কিন্তু তার অতি ছোট্ট কুঁড়েঘর এত গুণের সমাহারে এক প্রতিভাপূর্ণ আশ্রয়শালায় পরিণত হতো না। তাই সে বার বার ধন্যবাদ জানায় তার কুটীরালয়কে তিনি যে কত বড় তা জানায় ঈশ্বরকে। এক জাজ্জ্বল্যমান দেবালয়ে পরিণত করার জন্য পথভোলাকে সে সঙ্গে রেখেছে, যে পথভোলা আজ সঞ্জীবনী প্রাণের এক প্রান্ত যজ্ঞশালা। এই যজ্ঞশালা তার সার্থক। ইতিমধ্যেই হঠাৎ পথভোলা জানতে পারে সে ডাক্তারি পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। মাটির কুটীরে সাঁঝের প্রদীপ যেন হঠাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্রের প্রদীপ জ্বেলে পথভোলাকে সমাদর করে। বাউলমশাই মনের আনন্দে গান গেয়ে ওঠেন—'নিশিদিন ভরসা রাখিস হবেই হবে'—পথভোলা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে তার পরম পিতৃদেবতাকে। বাউলমশাই পথভোলাকে বলে—

বাবা, আজ থেকে আর তোকে আমি পথভোলা বলে ডাকব না। আজ থেকে তোর আমি দিলাম পথের আলোয়— বাবা তুই শহরে যাস না। গ্রামের মাটিতে তুই মানুষ তাই এই গ্রামেকেই তুমি সেবাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোল। বাবার কথামত পথভোলা তার বাবাকে প্রস্তাব দিল যে বাবা এই কুটীরই আমাদের আলো দেখিয়েছে। এসো তোমার দেওয়া নামেই প্রতিষ্ঠিত হোক আমার গ্রাম্য মানুষের চিকিৎসা কেন্দ্র এবং এই সেবাকেন্দ্রর নাম রাখা হোক পথের আলো যা আমাদের স্বপ্নের নাম, ভবিষ্যতের নাম।

কথামত সেই মাটির কুটীর থেকেই শুরু হলো চিকিৎসা দেবার চিন্তা ও

ভাবনা। সিদ্ধান্ত নেবার সঙ্গে সঙ্গেই মনের গতি চলে অত্যন্ত দ্রুতভাবে। অতি দ্রুত কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র জোগাড় করে পথভোলা শুরু করে তার চিকিৎসার কাজ। গ্রামের মানুষের নিকট পথভোলা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র জোগাড় করবার জন্য মাত্র ১ টাকা দক্ষিণা নেয়। কিন্তু বিনা পয়সায় ওষুধ ও আর্ত মানুষের পাশে সে যখনই প্রয়োজনে ছুটে যায়। তাই পথভোলা আজ মানুষের নিকট গণদেবতা—সেই গণদেবতার সুবাদে গ্রামের মানুষের বার্তা ক্রমে ক্রমে রটে যায় অন্যান্য গ্রামেও। আশেপাশের গ্রামের মানুষও চিকিৎসার জন্য ছুটে আসে পথভোলার কাছে। পথভোলার আশা চিকিৎসার সুযোগটাকে বাড়াবার জন্য। কিন্তু অর্থের অভাব থাকায় পথভোলা গ্রামের সকলের কাছে নিকট আবেদন জানায়—আসুন না সবার সাহায্যে আমরা এই চিকিৎসালয়টাকে মানুষের স্বার্থে একটু বড় করে তুলি। গ্রামের মানুষরা নিজেরা তাদের সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে এসে উদ্যোগী হলেন। শুভ নববর্ষের শুভদিনে গ্রামের সবচেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠা একজন মহিলাকে দিয়ে সেই চিকিৎসালয় উদ্বোধন করা হলো। যাতে অন্যান্য গ্রামেও এ চিকিৎসার আলো গিয়ে পৌঁছয়।

যারা বিনা চিকিৎসায় মারা যেত তারা আজ অন্তত চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে। পথভোলার দিন এভাবেই কেটে যাচ্ছিল। নিজের মন প্রাণ সঁপে দিয়েছিল সে সেবার কাজে। আর অন্যদিকে চিন্তা করবার অবকাশ তার ছিলো না।

কিন্তু ভাগ্যের অমোঘ বিধানে পথভোলা আচমকাই এক নতুন ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসক হিসেবে পথভোলা কখনোই চেষ্টা করেনি রোগীর পরিচয় বা কোথায় তার আস্তানা সে সম্বন্ধে জানবার ; কিন্তু একদিন পথভোলা লক্ষ করে, একজন যুবতী মেয়ে প্রায় আধপোড়া শরীর নিয়ে তার চিকিৎসালয়ে চিকিৎসার জন্য আসে, মানে তাকে নিয়ে আসা হয় প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায়। তার মুখের কিছুটাও কালো হয়ে গেছে। মুখের পোড়া অংশে মলম লাগাতে গিয়ে হঠাৎ পথভোলার মনে পড়ে মুখটা যেন একটু চেনা চেনা মনে হচ্ছে। রোগীর অবস্থা ভালো নয়। তাই সে রোগিণীর নাম কী জিজ্ঞাসা করে যে তাকে নিয়ে এসেছিল তাকে জিজ্ঞাসা করেন রোগিণীর নাম-ধাম-বৃত্তান্ত। তাই জেনে সে বুঝতে পারে তার বোঝার অঙ্কটা ভুল হয়নি, এ মুখ তার প্রথমদিন থেকে মনের শূন্যস্থানে গুপ্ত করে রাখা ছিল। যাইহোক, পথভোলা

যখন বুঝতে পারলো যে এটা কোকিলা তখন কোকিলাকে যে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল তার কাছে পথভোলা জানতে চাইলো কোকিলার এরকম ঘটনা ঘটলো কী করে? আস্তে আস্তে সে জানতে পারে। আসলে কোকিলার বিয়ের বয়স অনেকদিন আগেই গ্রামের মেয়ে হিসাবে হয়ত পার হয়ে গেছে। তার বাড়ির লোকেদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কোকিলার বিয়ে হয়নি। কারণ কোকিলার গায়ের রঙ খুব কালো আর কালো মেয়েকে যদি বা কেউ বিয়ে করতে রাজী হয় তবে পণের জন্য যা দাবি তা মেনে অত যৌতুক দেওয়া কোকিলার পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়। মেয়ের চিন্তায়-চিন্তায় বাবা মারা গেছেন। বাড়িতে বিধবা মা, আর কেউ নেই। তাই অনেকেই কোকিলার মাকে কেন মেয়েকে বিয়ে দিতে পারছেন না এই নিয়ে প্রায়ই অনেক কটূক্তি করে। কোকিলার মা পুকুরে স্নান করতে গেলে বা রাস্তায় বেরোলে এসব শুনতে শুনতে তাঁর কান ঝালাপালা হয়ে যায়। একদিন এত কটূক্তি তাকে শুনতে হয় যে, যখন আর সহ্য করে উঠতে পারে না তিনি তখন বাড়িতে এসে মেয়েকে পাছে এসব জানালে মেয়ে দুঃখ পায় তাই তিনি নিজের যন্ত্রণা নিজের মধ্যেই রেখে দেন কিন্তু সেদিন কোকিলার মাকে এতবেশি কটু কথা কোকিলার জন্য শুনতে হয়েছে যে তিনি রাগের মাথায় বাড়ি ফিরে প্রায় বলেই ফেলেছিলেন. কি দরকার ছিল তোর জন্মাবার আর জন্মালিই যদি তবে গায়ের রঙ কেন কালো নিয়ে জন্মালি! নিজেও নিজের জীবনে কোনো সদগতি করতে পারলি না আর তোর জন্য আমাকে কথা শুনে শুনে মরতে হচ্ছে, এর থেকে ভালো হতো জন্মেই যদি তুই মরে যেতিস— বলে কোকিলার মা এক নিশ্বাসে ঘরে ঢুকে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেন। কোকিলা অনেকবার মা দরজা খোল. দরজা খোল বলে মার নিকট অনেক আকুল আবেদন করে। কিন্তু যখন তার মা দরজা খোলে না তখন কোকিলা নিজেকে ঘৃণা করতে শুরু করে। কোকিলা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ; সে ভাবে মৃত্যুই একমাত্র তার মাকে নিশ্চিন্ত করতে পারে। আত্মহননের পথই তার একমাত্র পথ বলে তৎক্ষণাৎ তার মনে হয়। সে তখন একহাতে কেরেসিনের টিন আর হাতে একটা দেশলাই নিয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলেই দরজার বাইরে থেকে মাকে বলে, মা তুমি দরজা খুললে না তো? এই দেখো আমি আমার নিজের দায়িত্ব নিজেই নিচ্ছি। মা আমি গায়ে আগুন দিচ্ছি, তোমার মুখটা একবার দেখাও মা শেষবারের জন্য

কোকিলাব মা বিশ্বাস করতে পারে না কিন্তু একথা শুনেই তাড়াতাড়ি কোকিলার মা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখেন মায়ের সামনে কোকিলা আচমকা দেশলাই জ্বেলে কাপড়ে ছুঁইয়েছে আর আগুন ধরে গেছে। কোকিলার মা তাড়াতাড়ি বারান্দায় জলের বালতি ছিলো তাই দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বালতির জল মেয়ের গায়ে ঢেলে আগুন নিভিয়ে ফেললেন কিন্তু ততক্ষণ কোকিলার শরীরের ত্রিশ ভাগ অন্তত পুড়ে গেছে। তাই তিনি পাড়ায় দুজন যুবককে সঙ্গে নিয়ে কোনো রকম পথভোলা ডাক্তারের নাম জেনে তার নিকট চিকিৎসার জন্য তাকে নিয়ে আসেন। যুবকটি এই ঘটনাটা যখন ডাক্তার পথভোলাবাবুকে জানাচ্ছিল তখন কোকিলার মা-ও বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। আকুল হয়ে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করেন, ডাক্তারবাবু, কোকিলা বাঁচবে তো? আমার ও ছাড়া যে আর কেউ নেই। বলুন ডাক্তারবাবু ওর রঙ কালো এটা কি ওর অপরাধ? না আমার অপরাধ? ও কি কালো বলে এ সমাজে সম্মানের সাথে বাঁচার কোনো অধিকার ওর নেই? ডাক্তারবাবু আপনি কালো মেয়ের চিকিৎসা করতে আবার গররাজি হবেন না তো?

এক নিশ্বাসে কোকিলার মায়ের একরাশ প্রশ্ন! প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ডাক্তারবাবু শুনছিলেন। আর ভাবছিলেন বিচিত্র জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। তিনি কোনোরকমে কোকিলার মাকে আশ্বাস দিয়ে তাকে বাড়িতে চলে যাবার জন্য বললেন। তিনি এবার কোকিলাকে দেখতে আসেন।

তিনি লক্ষ করেন কোকিলার শরীরের ত্রিশ ভাগ পুড়লেও কিন্তু মাথায় সেই একগোছা কুঁচবরণ চুল যেন কালো রঙকে ঢেকে। কালো চুলের শোভায় কোকিলাকে ক্ষীণ এবং মনমরা দেখলেও সে কিন্তু তার চেহারার মধ্যে এক শান্তশ্রীর ভূমিকায় প্রায় নিজের মুখটাকে আড়াল করার চেষ্টা করছে।

ডাক্তারবাবু হঠাৎ তাকে বলেন কোকিলা—মুখ তোল, দেখো তো আমায় চিনতে পারছ কি না? ডাক্তারের মুখে কোকিলা তার নিজের নাম শুনে কিছুটা হতবাক হয়ে প্রায় মুখ ঘুরিয়ে তাকালো। এবং তারপরেই মুখ নীচু করে ফেলল। আত্মহত্যার করতে চেয়েও সে আত্মহত্যা করতে পারেনি বলে চরম লজ্জায় এবং চরম ঘৃণায়। পথভোলা প্রথম কয়েকদিন যাতে কোকিলার চিকিৎসার কোনো বিভ্রাট না হয় বা তার মানসিক বোঝা যাতে তাকে আঘাত করতে না পারে, তাই একদিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের চিকিৎসা আর অন্যদিকে তার

মানসিক দিকটাকে শক্ত করবার জন্য নানারকম কথা বলে মানসিকভাবে
যাতে সে তার এই করুণ অধ্যায়কে ভুলে যেতে পারে সেজন্য মাঝে মাঝে
নানা কথার মাঝে ও গল্পের ছলে কোকিলার মন ভোলানোর চেষ্টা করে
এরপর কোকিলা সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হয়ে যাবার পর সে যখন সেরে উঠেছে
বাড়ি ফেরার পালা আসছে, তখন প্রায় একদিন গল্পের ছলে কোকিলাকে অবাক
করে দিয়ে বলে উঠলো পথভোলা—কোকিলা দেখো তো আমাকে চিনতে
পার কী? কোকিলা বলে, হ্যাঁ। আপনি আমার চিকিৎসা করছেন আপনাকে
চিনব না?

পথভোলা বলে, আচ্ছা কোকিলা, তুমি যেদিন আন্তঃজেলা স্কুল
প্রতিযোগিতায় গান করেছিলে সেটা তোমার মনে আছে?

কোকিলা বলে হ্যাঁ, কিন্তু আপনি সেটা জানলেন কি করে?

পথভোলা বলে গানটা আর একবার গেয়ে শোনাবে ?

কোকিলা লজ্জায় বলে আমি এখন ভুলে গেছি। আসলে অনেকদি
আগেকার কথা তো?

পথভোলা বলে আচ্ছা সেদিন তুমি যেমন মেয়েদের বিভাগে প্রথ
হয়েছিলে। ছেলেদের বিভাগেও একজন প্রথম হয়েছিল। তুমি কি জানো সে
ছেলেটি কি গান গেয়েছিল?

কোকিলা উত্তর দেয়—গানটা খুব ভালো লেগেছিলো কিন্তু গানটা এখ
আর আমার মনে পড়ছে না।

পথভোলা তখন বলল দেখো তো গানটা চিনতে পার কি না? ব
পথভোলা গানটা গেয়ে কোকিলাকে অবাক করে দিয়ে তার স্মরণীতে
দিনটার পথভোলা যে আজকের চিকিৎসক সেটা আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল

কোকিলা কিন্তু নির্বিকার।

এবার পথভোলা বলতে শুরু করল,

আচ্ছা কোকিলা তোমার ছোটবেলার কিছু স্মরণীয় ঘটনা মনে পড়ে কি
গল্পের ছলে কোকিলা তিন চারটে ঘটনা বলে। কিন্তু শেষের ঘটনায় সে প্র
বলেই ফেলে মজা করে, জানেন ডাক্তারবাবু, আমি যখন ছোট ছিলাম তখ
আমাদের গ্রামে একজন বাউল এবং তার ছেলে আমাদের গ্রামে এসেছিল এ
তারা প্রায় অনাহারে কষ্ট পাচ্ছিল। আমিই প্রথম দেখি বাউলের বাচ্চা ছেলে

পুকুরের জল খাচ্ছে। আমি না তখন বাড়ির থেকে তাদের জন্য নাড়ু নিয়ে আসি ছুটে আর তারা দুপুরে আমাদের বাড়িতে খান। খুব তৃপ্তি লাভ করে। বাউল ভদ্রলোকের গাওয়া গানে আমরা গ্রামবাসীরা ভীষণ মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। কিন্তু তারপরে আমরা আশায় আশায় থাকতাম এই ভেবে যে যদি কোনোদিন তারা আবার আসে কিন্তু তারা আর আসে না। কিন্তু গানটা আমার খুব মনে পড়ে।

পথভোলা বলে সেই বাউলকে দেখবে?

কোকিলা বলে তিনি এখনো বেঁচে আছেন?

পথভোলা বলে, একটু আপেক্ষা কর—বাউলমশাই এদিকে ছেলে খেতে আসছে না, দেরি হচ্ছে দেখে 'পথভোলা-পথভোলা' বলে ডাকতে ডাকতে পথভোলাকে খুঁজে বেড়ান। পথভোলা আওয়াজ দেয়—বাবা আমি এখানে। বাউলমশাই এসে সেখানে হাজির হয়। পথভোলা তখন কোকিলাকে বলে, ইনিই সেই বাউলমশাই। বাউলমশাই তো অনেকদিন আগেই গানের জগৎ থেকে অবসর নিয়েছে, সে হঠাৎ এই ধরনের আলোচনায় অবাক হয়ে যায়। আর পথভোলা যখন বাউলমশাইকে 'বাবা' সম্বোধন করে তখন কোকিলার মনের প্রশ্নের উদয় হয় তবে কি এই সেই বাউলমশাইয়ের ছেলে! গল্পের ছলে সে বলে ফেলেছে। সে অনাহারে পুকুরের জল খাচ্ছিল? কোকিলা লজ্জায় চাদর দিয়ে মাথা ঢাকে। পথভোলাও তাকে গুড নাইট বলে সেখান থেকে বাউলের সঙ্গে চলে যায়। সেদিনের মতো আলোচনার ইতি। কিন্তু কোকিলা সারারাত ধরে ভাবে সে কি বোকা, সে দুবার জীবনে দেখা হওয়া সত্ত্বেও বুঝতে পারেনি পথভোলা কে— অথচ পথভোলা কিন্তু সব মনে রেখেছে। সে ভাবছে কী করবে কাউকে কিছু না বলেই সকাল সকাল উঠে পালিয়ে যাবে না কি করবে। সে জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে পালাবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে যাবার পরে সে এক একা পথের আলো চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছে কিন্তু সে জানে না যে পথভোলাও সারারাত না ঘুমিয়ে বাইরে বসে আছে।

তাকে এভাবে বেরোতে দেখে পথভোলার সন্দেহ হয়, পেছন থেকে সে ডেকে ওঠে—কোকিলা, এত সকালে হাতে ব্যাগ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? কোকিলা বলে, আমি আমার জায়গায় ফিরে যাচ্ছি, আপনি আমার জন্য অনেক

করেছেন আমি কৃতজ্ঞ।

ইতিমধ্যেই বাউলমশাইকে 'পথভোলা' কালো মেয়ের করুণ কাহিনী শুনিয়ে রেখেছে। তাই ওদের দুজনের কথার মাঝে উপস্থিত হয় বাউলমশাই সে তো প্রাতঃভ্রমণ করে। সে বুঝতে পারে কোনো বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটতে চলেছে। তাই পথভোলা আর কোকিলার মাঝে দাঁড়িয়ে বলে, মা কোকিল আমার কালো মেয়ে, এসো আমার পথের আলোয় এসো। পালাচ্ছ কোথায় পালাবার পথ নাই, যম আছে পিছে। তোমাদের দুজনকে এসো আমার ঘরে 'কালো ও আলোর' দ্বৈরথে আমার কুটিরে তোমাদের নতুন জীবন শুরু হোক বাউলমশাই বলে ওঠে গানের ছন্দে, বহুদিন পরে।

—আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন পথভোলা আর কোকিলা দুজনে কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করে। নতুন করে নতুন জীবনে যা কালো রঙের জন্য কোকিলাকে এবং তার মাকে অনেক কটূক্তি শুনতে হতো। সেই কোকিলা আজ পথভোলার মানবী। আজ সে একজন নামকরা চিকিৎসকের স্ত্রী। কোকিলা ফিরে পেল বাঁচার সম্মান আর পথভোলা তার কাজ এবং কোকিলার কোকিল কণ্ঠের মধ্যে দিয়ে নিজেকে আর এ সমাজ ব্যবস্থার পরিকাঠামোকে নতুন করে জানতে শিখল। কোকিলার জীবন সংগ্রামে মানবিক সংগ্রামের জয় হলো।

জোনাকি

বাবা, মা, দুই ভাই, এক বোন—জোনাকিদের ছোট্ট সংসারের সদস্য এই পাঁচজন। মোটামুটি সচ্ছলভাবে সুখেই কাটছিল দিনগুলি। দুই ভাই —আকৃতি এবং প্রকৃতি, এক বোন —জোনাকি। পড়াশুনায় সবাই ভালো। বাবার ছিল একটা ছোট ব্যবসা —তাতেই সংসারটা চলে যাচ্ছিল মোটামুটি ভালোভাবেই। জোনাকির মা একজন খুবই উৎসাহী এবং সমাজসচেতন মহিলা। শুধুমাত্র ছেলেমেয়েদের মানুষ করা আর সাংসারিক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে নিজেকে তিনি আটকে রাখতে চান না ; বাইরে যে একটা আলাদা জগৎ আছে সে সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন। তিনি চান বাইরের প্রস্ফুটিত আলোকে নিজেকে আলোকিত করতে। বিয়ের আগে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করিছেলেন। কিন্তু সংসার ধর্ম পালন করতে গিয়ে পড়াশুনা করা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি প্রভাতীদেবীর পক্ষে।

ছেলেমেয়েদের ৭/৮ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পর প্রভাতীদেবী প্রাইভেটে প্রি-ইউ পরীক্ষা দিলেন এবং পাশও করে গেলেন দ্বিতীয় বিভাগে। এতে তাঁর উৎসাহ বেড়ে গেল ; বাড়িতে বসে পড়াশুনা করে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে গ্র্যাজুয়েশনটাও করে ফেললেন। প্রভাতীদেবীর অন্তরে তখন উৎসাহের প্লাবন। এবার তিনি বেছে নিলেন এক নতুন পথ। যে সমস্ত বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়ে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে পড়াশুনা করতে পারে না— তাদের ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য দশজন ছোট ছোট বাচ্চাকে বেছে নিয়ে সাংসারিক কাজকর্মের ফাঁকে রোজ সন্ধেয় দু-ঘণ্টা করে তাদের পড়াতে আরম্ভ করলেন ; না, পড়ানোর বিনিময়ে তিনি কখনই পারিশ্রমিক

নিতেন না। এটা ছিল তাঁর কাছে একটা নেশার মতো।

এতসবের মধ্যেও প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে প্রভাতীদেবী সাহিত্য নিয়ে এম. এ. পরীক্ষায়ও পাস করলেন। অনেকগুলো গরিব বাচ্চার পড়াশোনার দায়িত্ব তার কাঁধে ; আন্তরিকতা দিয়েই প্রভাতীদেবী ওদের পড়ান। বাচ্চাগুলোও প্রত্যেকবার পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে। ওদের একেকজনকে প্রতিভায় সমুজ্জ্বল চরিত্র হিসাবে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর মানসিক ইচ্ছে। কাউকে প্রফেসর, কাউকে ডাক্তার, কাউকে এঞ্জিনিয়ার আবার কাউকে সমাজসেবী করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাই মনপ্রাণ ঢেলে বাচ্চাগুলোকে পড়াতে থাকেন প্রভাতীদেবী। অন্ধকার —অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আলোকিত উত্তরণের পথকে সুগম করতেই তিনি ওদের শৃঙ্খলা এবং ধৈর্যের শিক্ষা দেন। মহাপুরুষদের জীবন এবং বাণী তুলে ধরেন ওদের সামনে। দেশের জাতীয় ইতিহাসের কথা বলেন। ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে কখনও, আবার কখনও কবিতা কিংবা গানের মাধ্যমে ওদের নৈতিক মূল্যবোধ শেখান।

শিশুরাও প্রভাতীদেবীর সাহচর্যে ক্রমশ বড় হতে থাকে ; স্কুলে সবরকম পরীক্ষাতেই ওরা কেউ বা দ্বিতীয় স্থানেই থাকে। শিশুদের অভিভাবকরাও প্রভাতীদেবীকে যেন দেবীর মতো আরাধনা করেন এবং সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁকে বার বার কৃতজ্ঞতা জানান। প্রভাতীদেবীর এই যে শিক্ষকতা, ছোট ছেলেদের সত্যিকারের মানুষ করে তোলবার এই যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, সবকিছুর পেছনেই রয়েছে তার স্বামী-ছেলে-মেয়েদের অনুপ্রেরণা, ছোট ছোট দুঃস্থ বাচ্চাদের পড়ালেও নিজের ছেলে-মেয়ের পড়াশুনার জন্য আলাদা গৃহশিক্ষক আছে। তবে সব ব্যস্ততার মধ্যেও প্রভাতীদেবী সব ব্যাপারেই ছেলেমেয়েদের খোঁজ খবর রাখেন, কড়া নজর তার। দুই ছেলে এবং মেয়ে তিনজনেই খুব ভালো, শান্ত, নম্র বিনয়ী এবং পড়াশুনাতেও তারা খুবই ভালো, তাই ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে প্রভাতীদেবী এবং তার স্বামী অনেকটাই নিশ্চিন্ত। কিন্তু দশজন শিশু প্রভাতীদেবীর আন্তরিকতায় ও অনুপ্রেণায় তখন ফুটন্ত কুঁড়ি। আস্তে আস্তে তারা শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ। সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। কি হবে? এই চিন্তায় বেশ কিছুদিন আগে থেকেই প্রভাতীদেবীর চোখে ঘুম নেই। চেহারাও খুব খারাপ হয়ে গেছে। একদিন তিনি তার অতিপ্রিয় দশজন ছাত্রকেই ডেকে বললেন, দেখো, সামনেই তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষা। স্কুলের গণ্ডি পেরনোর এই যে প্রথম পরীক্ষা,

এর মূল্য জীবনের যে কোনো বড় পরীক্ষার থেকে বেশি। গত দশ বছর আমি তোমাদের নিজের সন্তানের মতো নিজের সমস্ত শিক্ষা, চেতনা তোমাদের উজাড় করে দিয়েছি। এবার তোমাদের গুরুদক্ষিণা দেবার পালা। মাধ্যমিক পরীক্ষায় তোমরা ভালো, খুব ভালো রেজাল্ট করো, সেটাই হবে আমার গুরুদক্ষিণা। আর যদি তোমরা ভালো রেজাল্ট করতে অসমর্থ হও, তাহলে আমি ভাবব আমার এতদিনের পরিশ্রম ব্যর্থ। তাহলে ব্যর্থতার দায় ঘাড়ে নিয়ে তোমাদের কেন, আর কাউকেই আমি মুখ দর্শন করাব না। বলতে বলতে তার এতদিনের ভাবাবেগ আপ্লুত হয়ে দুচোখের কোলকে ছাপিয়ে গেল। আর যারা এই মাতৃময়ীর স্নেহে, ভালোবাসায় শৈশব থেকে আজ কৈশোরে পরিণত হয়েছে তারাও পারল না নিজেদের সামলে রাখতে। চোখ ভিজে উঠল জলে। প্রভাতীদেবী বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ছাত্ররাও মাথা নিচু করে ভাব গম্ভীর পরিবেশে বসে রইল। প্রভাতীদেবী ফিরে এলেন মিনিট পাঁচেক পরে। তার হাতে একটা ছোট থালা, সেই থালার পূজার ফুল, চন্দন এবং ঘরে তৈরি নারকেলের নাড়ু। ছাত্ররা প্রভাতীদেবীর মুখে হাসি ফোটানোর জন্য থালার নারকেল নাড়ুগুলো নিজেরাই তুলে খেতে আরম্ভ করে দিল। প্রভাতীদেবী হেসে ফেললেন। প্রভাতীদেবী ছেলেদের প্রত্যেককে আশীর্বাদী ফুল দিলেন, চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন। ছেলেরাও তাকে প্রণাম করে বলল, আমাদের আশীর্বাদ করো মা, আমরা যেন তোমার এই কাঠোর পরিশ্রমের যথার্থ মূল দিতে পারি। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে গেয়ে উঠল বিশ্বকবির সেই গান, 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার।' সমস্ত পরিবেশটাই একদম হালকা ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। যাবার সময় সবাই কিন্তু মনে মনে শপথ নিতে ভুলল না, সে গুরুদক্ষিণা তারা দেবেই, যা একলব্যের গুরুদক্ষিণার মতোই সমাজের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। দেখতে দেখতে পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। প্রভাতীদেবী তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ সেরে ঠিক টিফিনের সময়েই হাজির হয়ে যান তাঁর ছাত্রদের কাছে। ছেলেরাও তাঁকে দেখে মানসিক বল ফিরে পায়। পরীক্ষার পর দীর্ঘ তিনমাস ছুটি। ছুটির দিনগুলোতেও অভ্যাস মতো ছাত্ররা প্রভাতীদেবীর কাছে আসত। তিনি এই সময় ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখতেন যে কোন ছাত্ররা কোন বিষয়ে আগ্রহী। কেউ ডাক্তারিতে, কেউ এঞ্জিনিয়ারিং লাইনে আগ্রহী, কারুর বা ওকালতিতে আবার কেউ বা চায় শুধু

তাদের 'মা' এর মতো শিক্ষকতা করে তাদেরই মতো ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে।

প্রভাতীদেবী, মহাপুরুষদের জীবনী, ভালো শিকারের গল্প, গোয়েন্দা গল্পের বই ছেলেদের হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়তে সাহায্য করেন। সময়ের গতি কিন্তু এদিকে এগিয়ে চলেছে। দেখতে দেখতে হু-হু করে কেটে যায় তিন মাস। ফল বেরোতে তখন মাত্র সাত দিন বাকি। ছাত্ররাও ভয়ে সব দিশাহারা আর তাদের 'মা'—ছেলেদের থেকেও যে বড় পরীক্ষা তার। ছেলেদের বড় করে তোলার স্বপ্ন কি তার অঙ্কুরেই বিনাশ হবে, নাকি বটবৃক্ষের মতো ছায়া ফেলে শান্তির নীড় তৈরি করবে? শনিবার দুপুর ঠিক দুটো বাজে, রেডিওতে তখন অনুরোধের আসর সবে শুরু হয়েছে, হঠাৎ বাইরে থেকে কানে আসে 'গেজেট, গেজেট, মাধ্যমিকের গেজেট বেরিয়েছে।'

প্রভাতীদেবী এক রাশ চিন্তা নিয়ে শুধু ঘর আর বাহির করতে থাকেন। কখন তার আরাধনার ফল তিনি জানতে পারবেন। প্রভাতীদেবীর কাছে এক এক মিনিট তখন এক একটা যুগ বলে মনে হয়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়, চিন্তার পাহাড় মাথায় ওঠে। সূয্যিমামা তখন অস্ত গেছেন। প্রভাতীদেবী জলস্পর্শ পর্যন্ত করেননি। তিনি আরাধ্য দেবতার সামনে তখন লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকেন আর বলেন, হায় রে বিধাতা! আমার জীবনের সব স্বপ্ন আমার এতদিনের পরিশ্রম সবই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? এর কি সত্যিই সঠিক মূল্যায়ন হবে না? এদিকে তারই সযত্নে লালিত ফোটা কুঁড়িগুলো যে সুরভিত হয়ে তাদের 'মা'র সঙ্গে দুষ্টুমি করছে এটা বোঝার ক্ষমতা তার হয়নি। চিন্তায় চিন্তায় অবসন্ন দেহটাকে যেন তিনি আর টানতে পারছেন না। বিছানায় এলিয়ে পড়েন। অথচ ইচ্ছে করেই দশজন সন্ধ্যার পর কাঁচুমাচু মুখ করে মলিন বদনে তার পায়ের সামনে এসে বসে। মাথা নিচু করে গম্ভীর ভাবে তাদের বসার ধরন প্রভাতীদেবী কেন যে কোনো কাউকে ভাবিয়ে তুলবে, বলবে এরা নিশ্চয়ই অকৃতকার্য হয়েছে। প্রভাতীদেবী যেন নিজের এই ব্যর্থতা স্বীকার করে নিতে পারেন না। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। সত্যিকারের পরিশ্রম যে কখনো ব্যর্থ হয় না, তা বোধহয় শিক্ষিতা সমাজ সচেতনা প্রভাতীদেবী ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেলেও ছেলেরা তাকে ভুলতে দেয় না।

সবাই মিলে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে মা গো, কিসের তোমার এত চিন্তা? আমরা সাফল্যের সঙ্গে তোমার সম্মান রেখেছি। প্রভাতীদেবীর সারা শরীরে

বিদ্যুতের শিহরন খেলে যায়, তার মনও সাফল্যের দোলায় যেন দুলে ওঠে। তিনি চোখের জল মুছে উঠে বসেন, জানতে পারেন তারই হাতে গড়া দশজন ছাত্রই স্টার অর্থাৎ শতকরা ৭৫ ভাগ নম্বর পেয়ে স্কুলের সেরা ফল করেছে। প্রভাতীদেবীর খুশিমাখা মুখ, তার বুকভরা আনন্দ তার প্রিয় ছাত্রদেরও নাড়া দিয়ে যায়। প্রভাতীদেবী সস্নেহে ধমক দেয়, 'তোরা খুব দুষ্টু হয়েছিস তো! আমাকে সারাটা দিন শুধু শুধু চিন্তায় ফেললি। আমাকে আগে কেন খবর দিলি না? আর একটু হলে তো আমা হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত। দুষ্টুগুলো সব এক হয়েছে। সবাই মিলে হৈ-হৈ করে ওঠে, বলে, তুমি ভাবলে কি করে যে তোমার এত দিনের সারস্বত সাধনা আমরা ব্যর্থ করে দেব। তুমি কি আমাদের একটু ভরসা করো না? আমরা তোমারই শিক্ষার আলোতে, চিন্তাধারায় বড় হয়েছি, এত সহজে তো আমরা হারব না। আজ থেকে আমরা তোমার আশীর্বাদ নিয়ে জয়ের পথেই শুধু চলব। প্রভাতীদেবীর স্বগতোক্তি তোদের সার্থকতা আমার সংগ্রামী মনোভাবকে অনেক বাড়িয়ে দিল। তোরা অনেক বড় হ। আকাশছোঁয়া হোক তোদের সম্মান। আমি তোদের ভবিষ্যৎ ভেবে এখনই গর্ব অনুভব করছি।

ছেলেরা আবদার করে, একটা গান গাও না মা—

প্রভাতীদেবী অনেকদিন পর গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলেন, দোলাও দোলাও দোলাও আমার হৃদয়, তোমার আপন হাতের দোলে। ছেলেরাও গলা মিলিয়ে মা-এর সঙ্গে গান ধরল। বিকশিত কুঁড়ির সৌরভে সুরভিত হয়ে উঠল পরিবেশ। আলোকেরই ঝরনাধারায় স্নাত হয়ে উঠল সবাই। গান শেষ হয়ে গেলো। প্রভাতীদেবী রান্নাঘর থেকে নিজেরই হাতে তৈরি করা লুচি, আলুরদম, মোয়া, নাড়ু যা ছিল ঘরে, সবই নিয়ে এসে তার ছেলেদের হাতে তুলে দিলেন, ছাত্ররাও মহা আনন্দে খাবারগুলো ভাগ করে নিল।

প্রভাতীদেবী ছেলেদের ডেকে বলেন, শোন জীবনের পথ কিন্তু কাঁটায় ভরা। সামনের দিন সেই পথেই তোমাদের চলতে হবে এবং পৌঁছতে হবে তোমাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট লক্ষে। উচ্চশিক্ষার জন্য আমার যতটা সাহায্যের প্রয়োজন, তোমরা পাবে, তবে এখন থেকে তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই তুলে নিতে হবে, কারণ আমার পক্ষে হয়ত সব ব্যাপারে এখন আর তোমাদের গাইড করা নাও হতে পারে। শিক্ষার মান বদলেছে, বদলে গেছে পড়াশুনার ধরনও, তাই সব ব্যাপারে সব সময় না থাকলেও আমার দ্বারা তোমাদের জন্য

সবসময় খোলা থাকবে।

ছাত্ররা কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু তাদের মন পড়ে থাকে তাদের ছোটবেলার পাঠগৃহে। কলেজ থেকে ফিরেই তারা চলে আসে তাদের 'মা' এর কাছে। এটা তাদের রোজকার অভ্যাস।

প্রভাতীদেবীর স্বপ্ন স্বার্থক হয়েছে, তার প্রিয় ছাত্ররা কলেজের অধ্যাপকদের ও অত্যন্ত প্রিয়। প্রতিভাদেবী এবার একটু একটু করে সংসারে মন দেন, তার নিজের সন্তানেরাও বড় হয়েছে। ছেলেরা কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে আজ নিজ পায়ে দাঁড়ানর ব্যবস্থা করতে থাকে। কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ না পেয়ে বড়ছেলে আকৃতি বাবার ব্যবসায় যোগ দেয়। ছোট ছেলে প্রকৃতিও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে দাদাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে ব্যবসাতে। দুই ছেলের ব্যবসায়ী মনোভাব তাদের সংসারকে আগের থেকে অনেক বেশি সচ্ছল করে তোলে। কিন্তু প্রভাতীদেবীর যত সমস্যা তার একমাত্র মেয়ে জোনাকীকে নিয়ে। জোনাকি পড়াশুনোতে ভালোই। গানও সুন্দর গায়। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ঢুকেই রাজনীতি তাকে আকর্ষণ করে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধে, ছাত্রদের স্বার্থে লড়াই করতে গিয়ে খুব অল্পদিনের মধ্যেই জোনাকি কলেজে সবার খুবই প্রিয় হয়ে ওঠে। কলেজের ছাত্রসংসদে তিন থেকে চার বছর জোনাকি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে যাবার পরই চাকরির সুযোগ আসে। কিন্তু জোনাকির তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। রাজনীতির নেশা তাকে চেপে ধরে। বাইরের রাজনীতির হাতছানি সে যেন কিছুতেই অবহেলা করতে পারে না। কলকাতা থেকে অনেক দূরে প্রত্যন্ত এক অঞ্চলে থাকে বলে এলাকায় মারামারি অথবা সন্ত্রাস হলে জোনাকি এগিয়ে যায় রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করার জন্য। কখনও সহকর্মীদের সঙ্গে মিছিল করে, কখনো বা মিটিং এ দু-চার কথায় জোরালো ভাষণ দেয়। আবার পাড়াতে শীতকালীন স্পোর্টস অথবা বনভোজনে জোনাকি সবার আগে। বাচ্চারা ছুটে আসে, আবদার করে রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যাতে পাড়াতে যে ফাংশান হবে, সেখানেও জোনাকিকে থাকতে হবে। নাটকের রিহার্সাল থেকে শুরু করে বাচ্চাদের বিভিন্ন ভূমিকায় সাজিয়ে দেবার পেছনে তারই অনবদ্য শিল্পকলা থাকবে। এই নিয়েও কি রেহাই আছে! পাড়ার যে কোনো বিয়েবাড়ি হলেই, ডাক জোনাকিকে। কলেজে পড়া শেষ করে যে বিউটিসিয়ান কোর্স করেছিল, তারই প্রতিফলন করতে হবে কনে সাজিয়ে।

সে নিজে সাজে সুন্দর করে, আর কনে সাজায় ও নিজস্ব শৈল্পিক ভঙ্গিমায়। শুধু কনে সাজালেই তো হবে না। মেয়েকেও যে এবার কনের সাজে বসতে• হবে—বিয়ে দিতে হবে মেয়ের। বাড়ির মাসি পিসিরা জোর দিলেও মেয়ে কিন্তু নাছোড়বান্দা। স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তার মাকে—বিয়ে সে কিছু কিছুতেই করবে না। মা-ও আর মেয়েকে বেশি জোর দেন না কারণ মেয়ে তার অত্যন্ত অভিমানী। কখন যে কি করে বসবে সেই ভয়ে বাবা ও মাও মেয়ের সমস্ত আবদারই মাথা পেতে নেন। মেয়েও নিজের স্বাধীনতায় বিকশিত। তাই ভয় নেই, ডর নেই, কোনো লজ্জা বা সংকোচ সেই অর্থে নেই। তাই তার খুশিমতো চলাটা বাইরের সবাই মেনে নেন। জোনাকির স্বাধীনতা তার এগিয়ে চলার পথটাকে বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই মসৃণভাবে তৈরি করে দেয়। সবার সঙ্গেই তার সম্পর্ক মধুর এবং ভালোবাসার কিন্তু কোনো কারণে যদি তার প্রাধান্য কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে জোনাকিকে ধরে রাখা মুশকিল। জোনাকি তখন জোনাকি পোকার মতো টিমটিমে আলো না জ্বেলে দপ্ করে জ্বলে ওঠে। নিজের প্রাধান্য খর্ব করে কোনো বোঝাপড়াতেই জোনাকি রাজি নয়। অর্থাৎ ঝগড়া বেধে যায়। আর একবার ঝগড়া মানেই শুধু ঝগড়া নয় জোনাকির মুখে আষাঢ়ের মেঘ। ঝগড়া করেই হোক আর মুখ ভার করেই হোক যে ভাবেই হোক জোনাকির নেতৃত্ব দেওয়া চাইই-চাই। এই সমস্ত নানান কাজকর্মে বিভিন্ন ধরনের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয়ের মাত্রাটা ক্রমশই জোনাকির নিজস্বতায় বেড়ে ওঠে।

এই চলমান জীবনমাত্রায় হঠাৎই একজনকে তার খুব ভালো লেগে যায়। ছেলেটি ব্যাপারটা প্রথমটায় ঠিক বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পারে যে জোনাকির প্রতি কোথায় যেন একটা ভালোলাগার আবেগ তার মনকেও বোধহয় ছুঁয়ে গেছে। এদিকে ছেলেটির পরিবার আবার অত্যন্ত গোঁড়া ধর্মীয় পরিবার। নিজেদের জাতের মধ্যে না হলে তাদের বাড়ি অন্য জাতের কোনো মেয়েকে কিছুতেই পুত্রবধূ হিসাবে বরণ করে নেবে না। প্রয়োজনে ছেলেকে ত্যাগ পর্য্যন্ত করতে পারে। কখনো কফি হাউস, কখনো ভিক্টোরিয়ার খোলা হাওয়ার ওদের দুজনের ভালোলাগা তখন ভালোবাসায় নিবিড়। ছেলেটার বাড়ির ধর্মীয় গোঁড়ামির কথা জোনাকি জানে। কিন্তু সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কারণ জোনাকির ধারণা শৌভিক অর্থাৎ জোনাকির নিজের মানুষটির মতো সে শৌভিকদের বাড়ির সবার মন জয় করতে হবে। কিন্তু অলক্ষে অন্তর্যামী

বোধহয় সেদিন হেসে উঠেছিলেন। তাই কিছু কথা, কিছু ছোঁয়া, নির্বাক কতগুলো মুহূর্ত যখন ওদের ভালোবাসাকে কফির উষ্ণতা দিয়ে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলেছিল, ঠিক তখনি এক পড়ন্ত বেলায় শৌভিকের বাবা-মা হলুদ-সিদুঁর নিয়ে শৌভিক এর বিয়ের পাকা কথা অন্যত্র করে আসেন। বাড়িতে ফিরে শৌভিক সেটা জানতে পারে। প্রথমে মৃদু, পরে তীব্র প্রতিবাদেও যখন কিনারা হয়নি তখন অনেক কষ্ট হলেও জোনাকিকে ভুলে গিয়ে শুধু ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতে মা-বাবার পছন্দ মতো মেয়েকে বিয়ে করবে ঠিক করে। জোনাকি তখনও ব্যাপারটা জানত না। যখন জানল, সে সরাসরি শৌভিককে জিজ্ঞাসা করে। শৌভিক যেন এই কদিনের অসাক্ষাতে অনেকটা পাল্টে গেছে। সে সোজাসুজি জানায় বাবা-মার অমতে সে বিয়ে করতে পারবে না। দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে জোনাকি। স্থির করে ফেলে তার পরবর্তী কর্মসূচী। যে জীবন গড়ার স্বপ্ন শুধু জোনাকির একারই ছিল না, ছিল শৌভিকেরও। সেই জীবনের সমস্ত আলোটা নিয়ে শৌভিক চলে গেল। পড়ে রইল শুধু পাঁচ বছরের স্মৃতি আর কান্না। তাই সে দুর্বিষহ জীবন কিছুতেই মেনে নেবে না—বরঞ্চ আত্মহত্যা করে নিজেকে মুক্ত করবে। চটজলদি পাশের ওষুধের দোকান থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ কিনে ফেলে এবং বলতে গেলে এক নিঃশ্বাসে খেয়েও নেয়। প্রভাতীদেবী রান্নাঘর থেকে যতবারই ঘরে আসেন ততবারই দেখেন মেয়ে চুপটি করে একজায়গায় বসে আছে। আজ যেন জোনাকি হঠাৎই ভীষণ শান্ত। আসলে শরীর ততক্ষণে ঘুমের ওষুধের বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। হাত-পা কিছুই নাড়তে পারছে না। মা এই অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ্য করেন। মার মনে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে। মেয়ের গায়ে হাত দিতেই হঠাৎ জোনাকি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত ডাক্তারের সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হলো। বাড়ির সবাই তখন প্রমাদ গুনছে, কি হয়! কি হয়! কিন্তু তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য এবং ডাক্তার সিস্টারদের আন্তরিকতায় আস্তে আস্তে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে জোনাকি বাড়ি ফিরে আসে প্রভাতীদেবী, তার স্বামী, আকৃতি, প্রকৃতি সবাই জোনাকিকে আগলে রাখেন, পাছে অবসাদগ্রস্ত হয়ে আবার না কিছু করে। এই খবর কেউ জানতেও পারে না। ইতিমধ্যে জোনাকির দূর সম্পর্কের এক দিদি ঘাটশিলা থেকে ওদের বাড়ি আসলে প্রভাতীদেবীর কাছে জোনাকির সব ঘটনা জানতে

পারেন। এবং ফিরে যাবার সময় জোনাকিকে ঘাটশিলা নিয়ে যান। হাওড়া স্টেশন থেকে রাত্রি ঠিক ৮টা বেজে ৩০ মিনিটে ট্রেন ছাড়ে। ট্রেনে যেতে যেতে চমকে ওঠে জোনাকি। আজই তো ২০শে নভেম্বর—শৌভিকের বিয়ে। দুচোখ ছাপিয়ে জল আসে। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য লীলা, ভালোবেসে শুধু কান্নাকে সম্বল করে অতীতকে সঙ্গে জোনাকির নিঃশব্দে চলে যাওয়া আর অন্যদিকে ঠিক একই সময়ে অনেক আলো, সানাইয়ের সুর, অনেক লোকজন হৈ-হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে শৌভিকের শুভদৃষ্টি বিনিময়, মালাবদল করে জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়া—সবই যেন কেমন দ্রুত হয়ে যায়। ঘাটশিলা এসে জোনাকিকে ওর দিদি স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করেন। জোনাকিও আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণভাবেই বাইরের জগতে। মাঝে মাঝেই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। রাতের তারা ভরা আকাশ এর দিকে তাকিয়ে তার বুক চিরে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাস রাতের অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে তোলে, প্রশ্ন করে জোনাকি নিজেকেই—আচ্ছা কি অপরাধ আমার? শুধুমাত্র একটা ধর্মীয় গোঁড়ামি তার জীবনের সমস্ত স্বপ্নকে চুরমার করে দিল, সে প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারল না। যাকে সে ভালোবেসে বাঁচবে ভেবেছিল, সেও তাকে গ্রহণ করল না, ধর্মীয় গোঁড়ামির কাছে মাথা নত করল। নিজে বাঁচার জন্য মৃত্যু চাইল। কিন্তু মৃত্যুও তাকে ফেলে রেখে গেল স্মৃতি সম্বল করে। এই অবচেতন মনের হাজারো প্রশ্ন জোনাকির বুকে প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলে দেয়। কিন্তু কার ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে সে? সে যে শৌভিক এখনও ততটাই ভালোবাসে। শৌভিককে তাকে ভুলে গেলেও জোনাকি তাকে ভোলেনি। ভুলতে পারেনি। আজও অবসন্ন মুহূর্তে স্মৃতিগুলো ভিড় করে আসে। ভাবে এটা যদি কোনো দুঃস্বপ্ন হয়। স্বপ্ন, দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়েই সময় নিজের গতিতে এগিয়ে চলে। জোনাকি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নতুন করে তৈরি করে। সামাজিক জীবনে আগের মতো করেই এগিয়ে আসা, রাজনীতিতে নতুন করে আবার সক্রিয় অংশগ্রহণ জোনাকিকে সময় কাটতে সাহায্য করে। এরই মধ্যে প্রভাতীদেবীর হাতে গড়া একজন ছাত্র সে এখন একজন প্রতিষ্ঠিত এঞ্জিনিয়ার, কৌশিক প্রভাতীদেবীর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে আসে। দেখে বাড়ির আবহাওয়াটা যেন অনেক বদলে গেছে। প্রভাতীদেবী তার কুশল জানতে চান। তার কাছ থেকেই জানতে পারেন তার অন্যান্য ছাত্ররা প্রত্যেকেই আজ নিজের যোগ্যতায় কলকাতা, দিল্লি, বম্বের বড়

বড় অফিসে চাকরি করে। কেউ বা ডাক্তার হয়ে বিলেত গেছে, কেউ বা হাইকোর্টের বড় উকিল। প্রভাতীদেবীর বুক ভরে ওঠে আনন্দে। কৌশিক জিজ্ঞাসা করে, মা, আকৃতি, প্রকৃতির কি খবর? দুজনেই কি চাকরি করে? প্রকৃতি কি আগের মতোই দুষ্টু আছে? প্রভাতীদেবী জানান, ছেলেরা বাবার ব্যবসাতে মন দিয়েছে। কৌশিক জানতে চায়, 'মা জোনাকি কত বড় হয়েছে? এতদিনে নিশ্চয়ই ওর বিয়ে হয়ে গেছে?

প্রভাতীদেবীর ছলছলে দুটো চোখ কৌশিককে কোথায় একটা 'কিন্তু' দিয়ে যায় এরই মধ্যে প্রকৃতি আর জোনাকি একই সঙ্গে বাড়ি আসে। প্রকৃতি কিন্তু কৌশিককে দেখে ঠিক চিনতে পারে, বলে কৌশিকদা না! আরে কি খবর? এতদিন পরে কোথা থেকে?

কৌশিক কিছু বলার আগেই লক্ষ করে জোনাকি আগের তুলনায় অনেক শান্ত, অনেক গম্ভীর, ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল। এই বাড়িতে কি যেন একটা হয়েছে! কিন্তু এত অল্প সময়ে তা বোঝা সম্ভব নয়। কৌশিক ব্যস্ত হয়ে ওঠে বলে, মা, আজ আমার একটু তাড়া আছে। আমি আবার অন্যদিন আসব। যাবার সময় মাকে নমস্কার করতে ভুলল না। প্রকৃতিকে বলে গেল, অবসর মতো আমার অফিসে এসো। গল্প করা যাবে। বলেই নিজের ছোট্ট মারুতির একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে চলে যায়। কৌশিক ওদের বাড়িতে কথা প্রসঙ্গে চাপা পড়ে থাকে।

এরই মধ্যে প্রকৃতি একদিন নিজেদের ব্যবসার কাজে মিডলটন স্ট্রিটে যায়। হাতে সময় আছে। কাজটাও তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। দাদা অর্থাৎ আকৃতি নিশ্চয়ই এখনো অফিসে আসেনি। কি করবে? ভাবতে ভাবতে প্রকৃতির মনে পড়ে কৌশিকের কথা, পার্ক স্ট্রিটেই তো ওর অফিস। প্রকৃতি সোজা চলে আসে কৌশিকের অফিসে। তখন লাঞ্চ টাইম। প্রকৃতিকে দেখে কৌশিক খুশিই হয়। দুজনে একসঙ্গে লাঞ্চ সারে। লাঞ্চের পরেই কৌশিকের ঘরেই একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে। খেতে খেতেই কৌশিক ফোন করে তার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সেক্রেটারিকে। বলে, এ সময় আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত, আসলে ২ টো ১৫ মিনিটে আমার ঘরে যে মিটিং আছে তা পিছিয়ে ৩ টের সময় করুন। আর এখন আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে প্লিজ, বলেই ফোনটা নামিয়ে 'এনগেজড' লাল বাতিটা ঘরের বাইরে জ্বালিয়ে দেয়। গল্প করতে করতে কৌশিক প্রকৃতিদের বাড়ির সব খবর নিতে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে জোনাকিও আসে। প্রকৃতি কৌশিককে জোনাকির ব্যাপার সবই

জানিয়ে দেয়, অনুরোধ করে, বলে, আপনি যে জোনাকির ব্যাপারে সব জানেন, তা যেন আমাদের বাড়িতে কেউ টের না পায়।

কৌশিকও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

ঠিক তার পরের দিন কৌশিক অফিস ফেরত জোনাকিদের বাড়িতে যায়। কৌশিক দেখে জোনাকি বাড়িতেই আছে। কথার ছলে প্রভাতীদেবীকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা মা! জোনাকি আমার সঙ্গে কথা বলছে না কেন? ও কি আমায় চিনতে পারছে না! প্রভাতীদেবী ডাকেন, জোনাকি এদিকে আয়। তুই হয়ত চিনতে পারছিস না। কৌশিক আমার ছাত্র ছিল, আজও অনেক বড় ফার্মে একজন প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার। আয় তোর সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিই। প্রভাতীদেবী ডাকার অন্তত ১০ মিনিট পরে জোনাকি আসে। নমস্কার করে সৌজন্য দেখায়। প্রভাতীদেবী ওদের আলাপ করিয়ে দিয়ে উঠে যান কৌশিকের জন্য চা-জলখাবার আনতে। কৌশিকই প্রথম কথা আরম্ভ করে, বলে, আচ্ছা জোনাকি, ছোটবেলায় তো খুব ভালো গান গাইতে, এখনও গাও? পড়াশুনাতেও তুমি খুবই ভালো ছিলে, কতদূর পড়েছ? জোনাকী উত্তর দেয় বি, এস-সি. পাস করে মন্টেসরি ট্রেনিং নিয়েছিল। আর পড়েনি।

কৌশিক প্রশ্ন করে আরো পড়লে না কেন? জোনাকি মুখটা কঠোর করে তোলে, বলে কি হবে ডিগ্রি বাড়িয়ে? রাস্তায় কি ডিগ্রি ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াব সবাইকে দেখাব! নাকি সার্টিফিকেটগুলো ল্যামিনেশন করে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখব। আচ্ছা বলুন তো এ সমাজে বাঁচার মূল্য কি? অনেক ডিগ্রি নিয়েও রাস্তায় ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানো ও নাকি অন্যের পদলেহন করা। তার থেকে এই ভালো অন্য জগতে কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত আছি—এই বেশ ভালো, বলুন আপনার সব কেমন চলছে?

কৌশিক বলে, বাবা! তুমি তো একম রাজনৈতিক নেতাদের মতো ভাষণ দিচ্ছ। শুধু একটা মঞ্চ তৈরি করে দিলেই হবে।

জোনাকি বলে, দেখুন আজকের যা যুগ তাতে মুখ না থাকলে তো চলে না। প্রতিবাদটাও তো প্রথমে এই মুখের ভাষার মাধ্যমেই হবে। এটাই যদি না থাকে, তবে তো মূক-বধিরের মতো সবই সহ্য করতে হবে। এটাই তো জীবন সংগ্রামে সব থেকে বড় এবং প্রথম সম্বল। আপনারা কেতাবী ভাষায় আমাকে ঝগড়াঝাঁটি বলতে পারেন, তাতে কিছু আসে যায় না। উত্তপ্ত আলোচনার মধ্যেই প্রভাতীদেবী কৌশিকের চা-জলখাবার নিয়ে ঢোকেন।

কৌশিক বলে, মা আপনার মেয়ের কথাতে আমার পেট ভরে গেছে। এখন শুধু এক কাপ চা হলেই হবে। হাল্কা হাসিতে পরিবেশটাও যেন অনেক হাল্কা হয়ে আসে। এরপর মাঝে মাঝেই জোনাকিদের বাড়িতে কৌশিকের আসা যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ওদের দুজনের সম্পর্কটা অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সব স্বাভাবিকতার মধ্যেও জোনাকি তার প্রথম জীবনে ঘটে যাওয়া অঘটনগুলোকে কিছুতেই ভুলতে পারে না। মনের ভেতর একটা তুষের আগুন যেন ধিক্ ধিক্ করে জ্বলে। কাউকে আপন করে নিতে আজ তার বড্ড ভয়। এ তো হাড় জোড়া দেওয়া নয়। হাড় ভেঙে গেলে তবু প্লাস্টার করে জোড়া দেয়া যায়, কিন্তু মন ভেঙে গেলে যে কোনো ওষুধই কাজ করে না। আজও তাই জোনাকি উদাস হয়ে যায়। মাঝে মাঝেই রাতের তারা ভরা আকাশে তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে আকুতি জানায়। তোমরা আমাকে তোমাদের আপন করে নাও না কেন?

ভবিতব্য কিন্তু অন্য ভবিষ্যতের জাল বোনে। অনেকদিন সময় নিলেও আস্তে আস্তে কৌশিক কিন্তু জোনাকির বিশ্বাস অর্জন করে। কখনো চা খেতে, খেতে, কখনো গল্পের সময় কাটিয়ে একে অপরকে জানার, চেনার অবকাশ পায়। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কৌশিক বেশ কিছুদিন হলো ওদের বাড়ি আসছে না। জোনাকিরও সন্ধেবেলা সময় কাটে না। মনটাও ভালো লাগে না। সে ভাবে, হায় রে বিধাতা! ভাগ্যে দুঃখ ছাড়া কি আর কিছুই নেই। একদিন ছোটভাইকে পাঠায়, বলে প্রকৃতি, গিয়ে দেখ তো কৌশিকদার অফিসে, সে কেন আসছে না? সে কি আমাদের ওপর রাগ করেছে?

প্রকৃতি খবর নিয়ে আসে, কৌশিকের টাইফয়েড হয়েছে। সাতদিন অফিসে ধরে অফিসে আসছে না। অসুখটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে। জোনাকির মনটা অজান্তেই ছটফট করে। মা কে বলে, চল না মা! কৌশিকদাকে একটু দেখে আসি, প্রভাতীদেবীর কাছে ছাত্ররা সন্তানের মতো। তিনিও রাজি হয়ে যান। পরের দিনই মা, মেয়ে হাজির হন কৌশিকের বাড়িতে। কৌশিকের মা তো প্রভাতীদেবীর কাছে ভীষণ কৃতজ্ঞ—আজ তার ছেলে সুপ্রতিষ্ঠিত, তার পেছনে যার অবদান সব থেকে বেশি তিনি আর কেউ নন প্রভাতীদেবী। তার আজকে কৌশিকের বাড়িতে, ওর মা কৃতজ্ঞচিত্তে সাদরে ওদের আপ্যায়ন করে বসতে দেন। বলেন, কৌশিকের খুব জ্বর। ও প্রায় বেহুঁশ। আমি তো চিন্তায় অস্থির। আপনারা এসেছেন, ভালোই হয়েছে। বাড়িতে তো কাজের

লোক ছাড়া কেউ নেই। অথচ ডাক্তারবাবু বলেছেন ওর কাছে সবসময় একজনকে থাকতে হবে। আমার যে ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। ওর যখন পাঁচ বছর বয়স তখনই তো ওর বাবা মারা গেছেন। তারপর থেকে তো আপনারাই ওর সব।

কথার মাঝেই কাজের ছেলেটা বলে, মা দাদাবাবু ডাকছেন। কৌশিকের মা একটু আসছি বলে ছুটে যান ছেলের ঘরে। ছেলেকে জানান তাদের বাড়িতে প্রভাতীদেবী ও জোনাকি এসেছে। জ্বরের মধ্যেও কৌশিক বিছানায় উঠে বসার চেষ্টা করে। কিন্তু মাথা ঘুরে যায়। শুয়ে শুয়েই ছেলে মাকে বলে, ওদের আমার ঘরে নিয়ে এসো মা।

প্রভাতীদেবী কৌশিকের কপালে হাত দিতেই সে চোখ মেলে তাকায়। তার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। প্রভাতীদেবী নিজের আঁচল দিয়ে জল মুছিয়ে দেন। জোনাকিরও খুব খারাপ লাগে, বলে, আপনি এত ভাবছেন কেন? আপনি খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবেন। কৌশিক আস্তে আস্তে বলে জোনাকি, মাথার খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, মাথাটা একটু টিপে দেবে? জোনাকি বিভ্রান্তিতে পড়ে। কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবার মধ্যে কোনো সঙ্কীর্ণতা থাকা উচিত নয়, তাই মায়ের ইশারায় সে কৌশিকের মাথায় তার নরম হাত বুলিয়ে দেয়, কৌশিকের যন্ত্রণা লাঘব করার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কৌশিক ঘুমিয়ে পড়ে। মা এবং মেয়ে দুজনে বাড়ি ফিরে আসে। কৌশিকের মাকে বলে প্রয়োজন হলে আমাদের খবর দেবেন।

সেই রাত্রে ঘুমের ঘোরে কৌশিক স্বপ্ন দেখে যে, জোনাকি যেন তার পাশে বসে তার মাথায় হাত বোলাচ্ছে। জ্বরের ঘোরে সে বলে ওঠে, জোনাকি অনেক হয়েছে। আর দিতে হবে না। এবার তুমি বিশ্রাম নাও। কালকে আবার দেখা হবে। কৌশিকের মা ঘুম ভেঙে গেলে সবই শুনতে পান, বুঝতে পারেন যে কৌশিকের মনে জোনাকির একটা জায়গা তৈরি হয়েছে। জোনাকিকে সামনে পেলে ওর মানসিক শান্তি ওকে হয়ত তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলবে। কৌশিকের মা পরের দিন বুদ্ধি করে কাজের ছেলেটার মারফত একটা চিঠি লিখে প্রভাতীদেবী ও জোনাকিকে নিজের অসহায় অবস্থার কথা লিখে আসতে অনুরোধ করেন। প্রভাতীদেবী, জোনাকিকে সঙ্গে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন। কৌশিক তার মা দুজনেই খুশি হন। অনেকক্ষণ গল্প হয়। কৌশিক জোনাকিকে বলে একটা গান শোনাও। জোনাকি লজ্জা পেয়ে যায়, বলে, দূর!

আমি এখন আর গান করি না। ভালো লাগে না গান গাইতে। সব ছেড়ে দিয়েছি। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, তখন গান শোনাব। কৌশিক আবদার করে, বলে—দু লাইন অন্তত গাও। জোনাকি ভাবল একজন অসুস্থ লোক গান শুনতে চাইছে। সে গান ধরে—যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে। গান, গল্পের মধ্যে দিয়ে জোনাকির বন্ধুত্বে কৌশিক আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু দুর্বলতা কাটেনি, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে কাজে যোগদান করতে এখনও সময় লাগবে। ডাক্তারবাবু পরামর্শ দেন কৌশিকের চেঞ্জে-এ যাওয়া প্রয়োজন। পাহাড় অথবা সমুদ্রের ধারে যেতে হবে। কৌশিক প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না। পরে মাকে বলে, মা, জোনাকি আর ওর মা যদি চায়, আমাদের সঙ্গে যেতে পারে, তাহলে সবার টিকিট কাটি, না হলে একা একা একঘেয়ে লাগবে। কৌশিকের মা প্রভাতীদেবীর বাড়িতে এসে একমাত্র সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের সঙ্গে বাইরে যেতে অনুরোধ করেন। জোনাকি জানার আগেই প্রভাতীদেবী সম্মতি দিয়ে দেন। জোনাকি জানত মা তাকে নিয়ে পুরীতে তীর্থ করতে যাচ্ছেন। কিন্তু স্টেশনে এ এসে দেখে সেখানে কৌশিক ও তার মা। জোনাকি অবাক হয়। মাকে বলে, মা ওরা কি আমাদের সাথে! কথা শেষ করার আগেই মা বলেন হ্যাঁ, কৌশিকের ইচ্ছাতেই সবাই যাচ্ছি। জোনাকি বলে, তুমি তো জান আমার এ জীবনে প্রতি কোনো মোহ নেই। তবে তুমি কেন আমাকে এভবে জড়াচ্ছ! লোকে জানতে পারলে কি হবে?

মা উপলব্ধি করেন মেয়ের দুঃখ। বলেন দেখ, মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের হাতে কিছুই করার নেই, যা ভবিতব্য তা তো হবেই। পুরনো দিনের কথা ভুলে যাবার চেষ্টা কর। আগে তুই তোর ন্যায্য সম্মান পাসনি। আজ যদি কেউ ন্যায্য সম্মান ন্যায্য অধিকার দিয়ে তোকে তোর দুঃখকে লাঘব করবার চেষ্টা করে তাহলে ক্ষতি কোথায়? ওর মতো ভালো ছেলে আজকের দিনে সত্যিই দুর্লভ। তুই মন থেকে বিদ্বেষ দূর কর। কথাবার্তার মধ্যেই ট্রেন এসে পড়ে। একটা ক্যুপে ওরা উঠে পড়ে নানারকম গল্প করতে করতে একসময় ক্লান্তি ঘুম হয়ে ওদের চোখে জড়িয়ে আসে। ভোরবেলা ট্রেন পুরী এসে থামে। হোটেলের ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল। ওরা সেই হোটেলের এসে উঠেছে। দুঘরে দুই পরিবারের থাকার ব্যবস্থা হলো। হোটেলে পৌঁছে এক কাপ চা খেয়ে স্নান সেরে খাওয়া-দাওয়া আর ঘুম। কৌশিক সন্ধ্যাবেলা হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখবে বলে

চাদর গায়ে দিয়ে এসে দাঁড়ায়। সমুদ্রের উথাল-পাথাল ঢেউ জোনাকির মনকেও উতলা করে তোলে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জোনাকি কেমন আনমনা হয়ে ওঠে। কৌশিক কিন্তু জোনাকিকে লক্ষ করতে থাকে। জোনাকি অবশ্য বুঝতেও পারে না। দু চোখ থেকে দরদর করে জল পড়তে থাকে, মিশতে চায় সাগরে। কৌশিক সব লক্ষ করে। কোন কিন্তু না রেখে বলে, জোনাকি আজ থেকে তোমার সব ভাবনা আমার। পুরনো দিনের কথা ভুলে যাও। এসো, আমরা নতুন সমাজ গড়ে তুলে দেখিয়ে দেব এ জগতে কেউই ফ্যালনা নয়।

জোনাকি বলে ওঠে, না না, আমার ভাবনা আমাকেই ভাবতে দিন। নতুন করে আর কিছু গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কৌশিক বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু জোনাকির চোখে অশ্রুর পাথার।

কৌশিক বলে, আমার সাথে জেদ করতে যেও না। তাহলে আমার মরামুখ দেখবে।

জোনাকি ভয় পেয়ে যায়। সে তাড়াতাড়ি কৌশিককে শান্ত করার চেষ্টা করে, চেয়ারে বসিয়ে দেয়। বলে, একি আবার যে জ্বর আসছে। কৌশিকের জন্য তড়িঘড়ি ডাক্তার ডাকা হয়।

ডাক্তার বলে যায়, দেখুন ওর শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। এ অবস্থায় ওকে কোনোরকম মানসিক চাপ দেবেন না। যে কোনো মানসিক আঘাত ওর জীবনে বড় অঘটন ডেকে আনতে পারে। জোনাকি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব শোনে। নিজেকে অত্যন্ত দোষী মনে হয় তার। এই অপরাধী মন ফেরার হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

রাতে সমুদ্রের জলে ঢেউগুলো নাচতে নাচতে এগিয়ে আসে আর ফিরে যায়। ঢেউ-এর বুকে তারার দুলকি চাল জোনাকীর মনকেও এক সূক্ষ্ম আবেগে দোলা দিয়ে যায়। বিবেক দংশন করে বলে একজনকে দিয়ে সবাইকে বিচার করা ঠিক নয়। একই মাপকাঠিতে সবাইকে ফেলাও ঠিক নয়। মানুষে মানুষে প্রভেদ নিশ্চয়ই আছে। সে নিজেকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করে নতুন ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়ে মনকে শক্তিশালী করার। কিন্তু ঘর পোড়া গোরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় তো পাবেই—তাই মনের কোণে একটা অদৃশ্য ভয় তাকে মাঝে মাঝেই চেপে ধরে জোনাকি নিজেকে শক্ত করে তোলে। কৌশিকের শারীরিক অসুস্থতা মানসিক চাপ, একমাত্র ছেলের জন্য

তার মায়ের টান টান উত্তেজনা সবই মিলিয়ে জোনাকির মনে কোথায় যেন করুণা হয়। জোনাকি কিছু না ভেবেই কৌশিকের মাকে বলে, কৌশিকদাকে সারিয়ে তোলার পুরো দায়িত্ব আমার। আপনারা বরঞ্চ বিশ্রাম করুন। প্রভাতীদেবী ও কৌশিকের মা দুজনেই বরফ গলতে দেখে খুশি হন।

কৌশিক চাদর দিয়ে পুরো শরীর, মাথা ঢেকে শুয়ে থাকে। শরীর খারাপ, তারপর মানসিক ঝড় তার মনের ভেতর যেন কালবৈশাখী ঝড়ের এক প্রচণ্ড তাণ্ডব নিয়ে আসে। অভিমানে মুখ খুলতে চায় না। অনেকক্ষণ জোনাকি তাকিয়ে থাকে। মায়া হয়। জোনাকি এগিয়ে গিয়ে কৌশিকের মাথা থেকে চাদর সরিয়ে দেয়। কৌশিকের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গান ধরে। 'যখন প্রথম ধরেছে কলি আমার মল্লিকা বনে।'

কৌশিকের অস্থির মন যেন একটু শান্ত হয়। কৌশিক ও জোনাকির হৃদ্যতা বাড়ে। একে অপরকে আপন করে নেয়। কৌশিক ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। দুজনের নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন আকাশের শূন্যতাকে ভরিয়ে দেয়। ছেলের মুখে হাসি মায়ের মুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ, জোনাকির চোখে উচ্ছলতা পুরীর সমুদ্র সৈকতে এক নতুন ঊষার ছাপ রেখে যায়, তার নাম ভালোবাসা।

এবার ফিরে আসার পালা, জীবনের সিদ্ধান্ত নেবারও পালা। কৌশিকের মা-ই প্রস্তাব দেন, জোনাকির মা অর্থাৎ প্রভাতীদেবীকে। আপনি আমার ছেলেকে মানুষ করেছেন, আপনার মেয়ে সে যে আমারও মেয়ে, সে আমার একমাত্র সন্তানের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। আসুন না, এই পুরীর মন্দিরকে সাক্ষী রেখে ওদের নতুন জীবনে প্রবেশ করাই। প্রভাতীদেবীও যেন দুশ্চিন্তামুক্ত। দুই মা পরিকল্পনা করে ওদের দুজনের হাতের বন্ধনকে হৃদয়ের বন্ধনে মিলিয়ে দিলেন। পুরীর উত্তাল ঢেউ-এর গর্জনে। সমুদ্রতটে চিক্‌চিকে বালুকণা পুরনো সব ব্যথা ভুলিয়ে দিলো। কৌশিক আর জোনাকি পরস্পরকে ভালোবেসে এক সুন্দর—নতুন জীবনে প্রবেশ করল। সাক্ষী হয়ে রইল পুরীর মন্দিরের প্রভু জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা।

উৎসর্গ

গ্রামের মুক্ত পরিবেশ, মাঝে মাঝই পুকুর, পুকুরে ফোটা পদ্মপাতা আর আখের ক্ষেতে গিয়ে আখ ভাঙা বা ছোলার ক্ষেতে গিয়ে ছোলা তুলে আনা আর আল পেরিয়ে লালমাটির ধুলোর ঝড়ের সঙ্গে পরিচয়টা ছোট্টবেলা থেকেই যেন একটা আত্মিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। ধান পোঁতা থেকে ধান কাটা, নবান্ন থেকে পৌষপার্বণ বাৎসরিক উৎসবের মতোই। প্রতি বছরই বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে গেলেই আমি আর দাদা দুজনে একটা অন্য রুটিন তৈরি করতাম।

বাৎসরিক পরীক্ষা যেদিন শেষ হতো, তার পরের দিনই ভোরবেলা আমরা দুই ভাই-বোন রামপুরহাটে মামাবাড়ি যাবার জন্য তৈরি হতাম। পরীক্ষা যেদিন শেষ হয়, সেদিন ছাত্রছাত্রীরা কত নিশ্চিন্তে ঘুমোয়, আর আমরা এতদিন পর মামার বাড়ি যাবার আনন্দে সারারাত প্রায় জেগেই কাটাতাম।

আমি আর দাদা দুজনে চলে যেতাম হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে রামপুরহাটের ট্রেনে উঠলেই শুধু মনে হতো বর্ধমানটা কখন আসবে? কারণ মামাবাড়িব জন্য সীতাভোগ আর মিহিদানা কিনতে হবে। বর্ধমান পেরিয়ে গেলে সময় যেন আর কাটতে চাইত না। ভাবতাম বোলপুর কখন আসবে? ট্রেনে কোন ভিখারি হয়তো গান ধরেছে—আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে ছায়া দেরে/ আল্লা ম্যাঘ দে। শহরের ইট-কাঠ-পাথরের প্রাণহীন পরিবেশে। মানুষ হওয়া আমরা দুটি ভাই-বোনও যেন তখন রাঙামাটির পথের সন্ধানে ছুটে চলেছি। এরই মধ্যে পার হয়ে গেছে সাঁইথিয়া, তারাপীঠ স্টেশন এসে গেলেই আমরা রামপুরহাট নামার জন্য ট্রেনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতাম।

মামা আসতেন রামপুরহাট স্টেশনে আমাদের নিতে। প্রথম প্রথম যখন সাইকেল রিকশা চালু হয়নি, তখন টোপর লাগানো গরুর গাড়িতে করে ভাঙাচোরা রাস্তা পার হয়ে টিম টিম করে কুসুম্বা গ্রামে যেতে হতো। পথ যেন আর শেষ হয় না। শুধু ভাবতাম কখন গিয়ে মামার বাড়ি পৌঁছব। কলকাতায় থাকতাম বলে আমরা বরাবরই মামার বাড়িতে তো বটেই, মামাবাড়ির গ্রামের সকলের কাছেই একটু বেশি আদর-যত্ন পেতাম। আমার মা যেহেতু বাড়ির বড় মেয়ে তাই আমাদের বাড়িতে যখন মামাবাড়ির কেউ আসত, তারাও যেমন প্রচণ্ড আতিথ্য পেত, সেরকম আমরাও যখন মামার বাড়ি যেতাম, তখন গরুর গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করতাম মামিমা, দাদু, দিদিমা, মাসিরা (যাদের তখনও বিয়ে হয়নি) সবাই দরজার সামনে অর্থাৎ রাস্তার সামনে আমরা কখন আসব, এই প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো।

ভোরবেলা ট্রেন ছাড়লেও কুসুম্বা গ্রামে এসে পৌঁছতেই অনেক বেলা হয়ে যেত। তাই গ্রামের পুকুরে স্নান সেরেই খেতে বসা। গ্রামের যে কোনো রান্নারই একটা নিজস্ব স্বাদ আছে। সুতরাং তৃপ্তি করে খেয়েদেয়ে গ্রামের বন্ধুরা তো আছেই, তার আগে মামার বাড়িতেই আমাদের একটা টিম ছিলো—আমার ছোট মাসি, মামাতো ভাই, বোন আমি আর দাদা—এই কজন মিলে ঠিক করতাম আমরা কী কী করব। কোথায় কোথায় যাবো ইত্যাদি। আর আমরা মামাবাড়ি এসেছি খবর পেলেই ছুটে আসত আমার মেজমাসির মেয়ে নমিতা। নমিতা আমাদের থেকে বয়সে বড় ছিল। আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীতে আর আমার দাদা সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। ছোট মাসিও পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। নমিতা চতুর্থ শ্রেণীতে আর মামাতো ভাই নীহার ও মামাতো বোন লতা ছিল একদম ছোট, ওরা তখন দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

মামাবাড়ির পাশেই স্কুল। আশেপাশের গ্রামের বহু ছেলে মেয়ে অন্যান্য গ্রাম থেকে কুসুম্বা গ্রামে পড়তে আসত। নমিতা আমাদের টিমে সবচেয়ে সহজ, সরল। তার বাড়ি আরো অজপাড়াগাঁয়ে। সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই বললেই চলে। তাই আমরা যে কদিন মামার বাড়িতে থাকতাম, নমিতাও সেই কদিন আমাদের সঙ্গে থাকতা। তখন মামার বাড়িতে অনেক জমিজায়গা ছিল, তাই যারা শীতকালে ধান কাটতে যেত, তাদের ভোর চারটের সময় উঠে দিদিমাকে চা করে দিতে হতো। আর তাদের

প্রাতঃরাশের জন্য গামছায় করে একগাদা মুড়ি, গরম গরম তেলেভাজা, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা সবই দেওয়া হতো। মামিমা এগুলো ঠিক করে দিতেন। আমাদের মামার বাড়িতেই মামার একটা দোকান ছিল, সেখানে সবকিছুই পাওয়া যেত। দাদু আর দিদিমা সকাল বেলায় যারা মাঠে যাবে, তাদের জন্য তেলেভাজা বাড়িতেই ভেজে দিতেন, কারণ গ্রামে তখন আর কোনো দোকান ছিল না।

দেশের বাড়িতে উনুনকে বলা হতো আখা। সেটা উনুনের মতোই মাটিতে পাতা। তাতে আখের শুকনো ছিবড়ে বা কাঠ জ্বালিয়ে তেলেভাজা ভাজা হতো।

একটা বড় লোহার কড়াইতে তেল চাপিয়ে দাদু আর দিদিমা তেলেভাজা ভাজতে শুরু করতেন। আর আমাদের টিমের সদস্যরা পরিকল্পনামাফিক কিছুটা ভাজা হয়ে যাবার পরই বাবা কি ঠাণ্ডা, একটু আগুন পোহাই—বলে দিদিমা দাদুকে ঘিরে বসে তেলেভাজার ঝুড়িটা যাতে হাতের কব্জায় থাকে, তার দিকে নজর রাখতাম। নিয়ম ছিল দাদু-দিদিমা ভেজে ভেজে এক একবার তুলবে আর আমাদের এক একজন যার হাতে যতটা ধরে, সে এক একটা ব্যাচে তার চাদরের তলায় জমা করবে। এইভাবে প্রথমে দাদা, তারপর ছোটমাসি, আমি, নমিতা, লতা, নীহার সবাই মিলে ভোর ৪ টেতেই দিদিমার ভাজা তেলেভাজার অর্ধেক নিয়ে নিতাম। আর হাফ কাপ করে চা খেয়ে বাবা রে বাবা কি ঠাণ্ডা বলে আমাদের মাটির দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে আবার লেপের তলায় গিয়ে ঢুকতাম আর কচ্‌মচ্‌ করে গরম তেলেভাজা খেতে খেতে যে দুষ্টুমি করতাম, তাই দিয়ে দিন শুরু।

আমাদের এই ফন্দির কথা কেউ জানতো না। শুধু মামিমা জানতো। কিন্তু মামিমা আমাদের ইশারা করে যেতো। এরপর সারাদিন কখনো মাঠে, কখনো জমিতে, কখনো আখের ক্ষেতে, কখনো বনভোজনে, কখনো বা গ্রাম পেরিয়ে অন্য কোন গ্রামে চলতো আমাদের অভিযান। পাড়া গাঁয়ে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সবাইকে শুয়ে পড়তে হতো। গ্রামে তখন রেডিও সম্বল। রেডিওতে ৭-৩০ মিনিটে যাত্রা হতো। আমরা লেপের তলায় ঢুকে যাত্রা শুনতাম। গ্রামে তখন রাত গভীর হয়ে নামছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝে মাঝে আমরা খুব ভয় পেতাম। নমিতাকে আমরা সব সময় বোকা বানাতাম। আমরা যাই বলতাম,

নমিতা তাই সহজ সরলভাবে বিশ্বাস করতো। রাত্রিবেলায় কেউ বিছানা থেকে উঠলেই নমিতাকে বলতাম, এই নমিতা চল, ওঠ। নমিতা ঘুমচোখে জিজ্ঞাসা করত, কোথায়? আমরা বলতাম, চল একটু জল খেয়ে আসি।

একদিন এমনিভাবেই নমিতাকে ডেকে তোলা হয়েছে। ও সামনে আর আমরা সিঁড়ি দিয়ে ওর পেছনে পেছনে কিছুটা নেমেই, ও কখন অনেকটা নেমে চলে গেছে। তখন আমরা ওপর থেকে ওরে বাবা ভূত—বলে সবাই মিলে এমন জোরে চিৎকার করেছি, ও বেচারি তখন পড়িমড়ি করে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে। হাঁটুর অনেকটা ছাল উঠে গেছে। তাই দেখে আমারও খারাপ লাগছে, কি আর করি ওকে তো শান্ত করতে হবে। গ্রামের দিকে ছেলেদের যেমন প্যান্টে পকেট থাকে, মেয়েদেরও থাকে। আমার ছোটমাসি তখন নিজের প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে রাখা মটরভাজা ওকে দিয়ে বলে, নমিতা মটর ভাজা খা। সব ঠিক হয়ে সাবে, আসলে অঘ্রান/পৌষ মাসে গ্রামের দিকে সন্ধ্যার পরে মটরভাজা বা ছোলাভাজা খাওয়া যাবে না, তাতে মা লক্ষ্মী রাগ করবেন। এই প্রথা চালু ছিল।

মামার দোকানের জন্য দিদিমা প্রতিদিনই ছোলা নয় মটর ভাজতেন। গ্রামে আমার মামার দোকানই একটা মাত্র দোকান বলে অসম্ভব চাহিদা ছিল। আর আমরাও পকেটে যতটা ধরত, ততটাই ভরে নিয়ে কোথায় 'মা লক্ষ্মী' আর কোথায় নিয়ম? বিছানায় লেপের ভেতরে নিয়ে ঢুকে, যাতে বাড়ির বড়রা কেউ আওয়াজ না পায়, তাই জোরে রোডও চালিয়ে দিয়ে যতক্ষণ ঘুম না আসে, ততক্ষনই মটর বা ছোলাভাজা চিবিয়ে যেতাম। এভাবেই নমিতাকে শিখণ্ডী খাড়া করে আমাদের ফন্দি চলতো।

মামা যখন ঘরে খেতে আসতেন বা স্নান বা বাথরুমে যাবার জন্য দোকানের বাইরে যেতেন তখন আমাদের কাউকে না কাউকে দোকানে কিছুক্ষণের জন বসিয়ে যেতেন। আর আমরাও তালে তালে থাকতাম, সেই সুযোগে লজেন্স বিস্কুট থেকে শুরু করে, যে যা পারতাম পকেটে ভরে নিতাম। আর মামিমাও আমাদের দোসর ছিল। সেই সুযোগে মামিমা যত পারত তেলের টিন থেকে সরষের তেল, চিনি আর সাবান যত পারত নিয়ে নিতো।

মামা কিন্তু একটু একটু করে আঁচ পেতে শুরু করেছিল। একদিন মাম চালাকি করে আমাকে আর ছোটমাসিকে এবং নমিতাকে বলল, শোন তোর

দোকানে একটু বস। গ্রামে একজন বয়স্ক মানুষ মারা গেছেন। আজই তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, আমি সেখানেই যাচ্ছি নিমন্ত্রণ খেতে। মামা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার যা যা প্রয়োজন, আমি নিয়েই এক দৌড়ে দোতলায় উঠে সব রেখে খালি হাতে ফিরে এসেছি মুহূর্তের মধ্যে।

ফিরে এসে দেখি, ছোটমাসি আর নমিতা তখন ঠিক করতে পারে নি কি কি নেবে! নমিতার হাত চানাচুরের শিশিতে আর ছোটমাসি অর্থাৎ ছায়ামাসির হাত গুড়ঝুরির শিশিতে। ওরা মুঠোয় সবে জিনিসগুলো নিতে যাবে, সেই মুহূর্তে মামা এসে হাজির। আচমকা মামাকে দেখে, খুব ভয় পেয়ে নমিতা আর ছোটমাসি তাদের অতিপ্রিয় খাবারগুলো মাটিতে ফেলে দিল। মামাও হাতেনাতে এতদিন পর চোর ধরতে পেরে মুচকি মুচকি হাসছে। নমিতা আর ছায়ামাসি তখন আমাকে দেখিয়ে বলছে, ও-ও তো নিয়েছে। আমি দেখালাম, আমার কাছে কিছুই নেই। ব্যস্, দোকানে বসার ডাক থেকে ওরা বাদ গেল। ওরা রেগে গিয়ে দোকানের বাইরে এসে আমার সঙ্গে আড়ি করে দিল। ছোটবয়সে আড়ি-ভাব যেন মুড়ি-মুড়কি। তাই আড়ি হলেই কিছুক্ষণের মধ্যে ভাব তো করতেই হবে। ছায়ামাসি আমার সঙ্গে ভাব করে নিলেও নমিতার কিন্তু রাগ কমল না। ও আমার ওপর অভিমান করে ওদের নিজের বাড়ি চলে গেল। দু-তিনদিন হয়ে গেল, নমিতা এল না। স্কুলেও আসছে না। শেষমেশ আমার দাদুর কাছে মেজমাসিকে দেখতে যাব বলে বায়না ধরলাম। দাদুও আমাদের যাবার জন্য সেই টোপর লাগানো গোরুর গাড়ি ঠিক করে দিলেন। নমিতা বাদে আমরা পুরো দলটাই হৈ-হৈ করতে করতে পাড়কান্দি গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের দেখতে পেয়ে নমিতার মা অর্থাৎ আমার মেজমাসি যারপরনাই খুশি হলেন।

মাসি তখন ভাবছে, আমাদের কি খাওয়াবে? কিভাবে আদরযত্ন করবে? মাসি তো আর জানে না, সে নমিতার অভিমান ভাঙাতেই তো আমাদের পাড়কান্দি গ্রামে আসা। আমরা তো খুঁজে বেড়াচ্ছি নমিতা কোথায়? চোখে পড়ছে না। হঠাৎ দেখি পাশের পুকুর থেকে নমিতা স্নান করে আসছে। হঠাৎ আমাদের দেখতে পেয়ে সব অভিমান ভুলে গিয়ে ও আনন্দে মেতে উঠল। নমিতা আমাদের জন্য ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে লুকোনো খাবার কি কি আছে তা দেখতে ভাঁড়ার ঘরে গেল। দেখি, অনেকগুলো নাড়ু নিয়ে ও আমাদের

এমনভাবে লুকিয়ে দিচ্ছে, যাতে কেউ না দেখতে পায়। নমিতা অনেকদিন ধরেই আমাদের কাছে কলকাতার গল্প শুনতো। কিন্তু কলকাতা কেন, এই অজ-পাড়াগাঁ ছেড়ে রামপুরহাট স্টেশনে যাবার সুযোগও তার হয়নি।

আমি ওকে উৎসাহ দেবার জন্য মেজমাসিকে বললাম, নমিতা এবার আমাদের সাথে কলকাতা যাবে! নমিতা তো খুশিতে ডগমগ। এরই মধ্যে বলতে শুরু করেছে, আমার যে ভালো জামাকাপড় নেই। আমরা বললাম, যা আছে, তাতেই হয়ে যাবে, আমরা ওদের গ্রাম ছেড়ে আসার সময় ওকে একদিন বাদে জামাকাপড় নিয়ে মামার বাড়িতে আসতে বললাম। ও যথারীতি ঠিক সময়ে একটা পোঁটলাতে জামাকাপড় নিয়ে এসে হাজির। আমি আর দাদা তো প্রথমে খুব হাসলাম। ওকে একটা ব্যাগ দিয়ে দাদা বলল, এর মধ্যে সব ভরে নে। মামাবাড়ি থেকে ছুটি কাটিয়ে যখন কলকাতায় ফিরতাম তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে যেত, কারণ আবার এক বছর পরে।

ছোটমাসি, মামিমা, ভাই-বোনেরা সবাই কাঁদতো আর আমরাও কাঁদতাম। মন খারাপ নিয়েই মামা আমাদের তিন মূর্তিকে ট্রেনে ওঠালেন। নমিতা তো ট্রেন দেখে প্রথমে এমনভাবে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল, যে মামা আর দাদা প্রায়, চ্যাংদোলা করে ওকে ট্রেনে তুললো। ট্রেনে উঠে দেখি, ট্রেন ছাড়ার অনেকক্ষণ পর্যন্ত ও চুপটি করে বসে আছে, তার মানে ওর ভয় তখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। দাদা বললো, এই নমিতা, ঝালমুড়ি খাবি?

নমিতা বলল, ও দাঁড়া, তোদের জন্য তো বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসেছি, বলে তাড়াতাড়ি একটা গামছা খুলল, দেখলাম, তাতে চালভাজা আর ছোলাভাজা। দাদা আমার দিকে তাকাচ্ছে, কারণ পাশে বসা অনেক সহযাত্রীই তাকিয়ে দেখছে গামছায় চালভাজা, ছোলাভাজা বাঁধা। দাদা বলল, আচ্ছা, তুই বরঞ্চ ওটা রেখে দে, ওটা বাড়িতে গিয়ে খাবো। তুই এখন ঝালমুড়ি খা, দেখ কি ভালো। নমিতাও সায় দিয়ে গামছা বেঁধে ব্যাগে ভরে রাখল আর মনের আনন্দে ঝালমুড়ি খেতে লাগল।

ট্রেন কু ঝিক্-ঝিক্ শব্দে কলকাতার দিকে ছুটে চলেছে। ভাবছি, হাওড়া কখন আসবে? এক একটা মুহূর্ত যেন আশঙ্কাতে ভরপুর। কারণ নমিতার সঙ্গে টানা ৬ ঘণ্টা ট্রেনে আসা মানে কখন সে কি বলবে? কখন সে কি করে বসে এই ভয়ে আমার দুই ভাই-বোন তো সদাসতর্ক। যাইহোক, ট্রেন যখন হাওড়া

স্টেশনে এসে পৌঁছলো তখন সূর্যদেব মধ্যগগনে। দেখি বাবা এসেছেন, আমাদের নিয়ে যেতে। নমিতা ট্রেন থেকে নামতেও ভয় পাচ্ছে। কোনোও রকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে হাত ধরে ওকে নামানো হলো।

হাওড়া স্টেশন থেকে আমরা একটা ট্যাক্সি নিলাম বাড়ি যাবার জন্য। নমিতা আমাদের কাছে আগেই কলকাতার রাস্তাঘাট, বাসট্রামের কাহিনী শুনেছে। তাই ট্যাক্সি তে উঠে ট্যাক্সিতে উঠে গাড়ি চলামাত্র বলতে শুরু করল, এই ট্রামটা কি ভালো রে। আমি বললাম, এটা ট্রাম নয়, এটা ট্যাক্সি। আমাদের সঙ্গে চল, সব আস্তে আস্তে দেখিয়ে দেব। নমিতার কথা শুনে তখন সামনের সিটে বসে ট্যাক্সি ড্রাইভার হাসছে। নমিতা বুঝতে পেরে বলল, ঠিক আছে, আমি আর বেশি কথা বলব না। বাড়ি এসে পৌঁছলাম। নমিতাকে দেখে, মা, আমার অন্যান্য ভাই-বোনেরাও খুব খুশি হল। নমিতাকে এবার একে একে কালীঘাটে মা কালীর মন্দির, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া সব দেখানো হলো। নমিতার আবদার, সে কখনো সিনেমা দেখেনি। তাই তাকে সিনেমা হলে-এ গিয়ে সিনেমা দেখাতে হবে। আমার এখনো মনে আছে, আমি, দাদা আর নমিতা গেছি পূর্ণ সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে। সেদিন ছিল ঝুলন পূর্ণিমা। হাফ্ টাইম হবার সঙ্গে সঙ্গে দাদা আমাদের জন্য খাবার আনতে বাইরে বেরিয়েছে। হঠাৎ দেখি, বড্ড বেশি তালের বড়ার গন্ধ বেরোচ্ছে। আশেপাশের লোকজন বলাবলি করছে, আরে তালের বড়ার গন্ধ কোথা থেকে আসছে? নমিতার এসব কথায় কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সে তার জামার পকেট থেকে একমনে কি যেন বার করছে। তাকিয়ে দেখি তালের বড়া। আমাকে বলছে, এই দেখ বড়মাসি আজকে যখন তালের বড়া ভাজছিল, তখন আমাকে অনেকগুলো বড়া খেতে দিয়েছিল। আমি নিয়ে এসেছি এখানে বসে খাব বলে। খা খেয়ে নে, খুব ভালো খেতে।

আমি তো লজ্জায় জড়সড়। মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে ওকে বলি, ওরে এটা তালের বড় খাবার জায়গা নয়। তুই তাড়াতাড়ি ওগুলোকে জামার পকেটে ভর। লোকে দেখতে পাচ্ছে।

নমিতা সহজ সরল ভঙ্গিতে বলে, খা-না রে, আমি নিজে না খেয়ে তোদের জন্য এত কষ্ট করে নিয়ে এলাম।

আমি বললাম, 'যাবার সময় তোকে ট্রামে চড়াবো। তখন তোর যত ইচ্ছা

তালের বড়া খাস। সিনেমা শেষ হলো। তখন আর ট্রামে ওঠার নাম নেই। আবার ট্রামে উঠে তালের বড়া নিয়ে বেকায়দায় পড়া। হেঁটে কালীঘাট মোড় পর্যন্ত এসে একটা ট্রাম দেখিয়ে ওকে বাড়ি নিয়ে এলাম। মাকে বললাম, মা নমিতার কোনো দোষ নেই, কিন্তু এত সহজ সরল, এত বোকা, যে ওকে নিয়ে কোথাও গেলেই আমরা খুবই বিপাকে পড়ি। তাই কোথাও বেড়াতে যাবার আগে ওকে ভালোবেসে আর তালের বড়া বা পিঠে খেতে দিও না।

এইবার নমিতার নিজের গ্রামে ফিরে যাবার পালা। জীবনে ও কখনো সিল্কের জামা পরেনি। তাই ওর খুব শখ একটা সিল্কের জামা পরার। যাবার আগের দিন আমরা কালীঘাটের বাজার থেকে সিল্কের জামা, রঙিন ফিতে, চুড়ি, জুতো সব নমিতার জন্য কিনে আনলাম। জীবনে নমিতা কখনো জুতোই পরেনি। আমরা সবাই জোর করে ওকে জুতো পরালাম। ও চলে গেল। ওরও চোখে জল। আমাদেরও সবার বিশেষ করে আমার এবং দাদার তো খুব মন খারাপ। বাবা একদিনের জন্য গিয়ে ওকে দেশে পৌঁছে দিয়ে এলেন। বাবা যখন দেশ থেকে চলে আসছিলেন তখনও নাকি ও খুব কাঁদছিল।

এরপর নানারকম ঝামেলায় ২/৩ বছর মামাবাড়ি যাওয়াতে ভাটা পড়েছিল। ছোট মাসির বিয়েতে বাবা আমাকে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে তুলে দিলেন আর মামাতো ভাই রামপুরহাট স্টেশন থেকে আমাকে নিয়ে গেলেন। ততদিনে আমাদের টিম ভেঙে চুরমার। আগের মতো কেউ কারো সঙ্গে আর গল্প করতে পারছি না। তারপরে বিয়ের দিন আমি গিয়ে পৌঁছেছি বিকেলবেলা। ছোটমাসি তো কনের সাজে বসে আছে। কথা বলার সুযোগ কোথায়? মনটা খারাপ লাগছে। অভিমান করেই মামিমাকে বললাম, আমার ঘুম পেয়েছে, কোথায় ঘুমাব? মামিমা বললেন, তুই নমিতা আর লতা গিয়ে কুসুমান্যতলায়, নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, ওদের বাড়িতে গিয়ে ঘুমো! ওই বাড়ির নাম শুনলে গ্রামে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে কারণ ওই বাড়িটাকে পরপর অনেকবার ভয়ঙ্কর ডাকাতি হয়েছে। বাড়ির বাসিন্দারা নিজেরাই প্রাণের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছে কেউ তা জানে না। আমাদের ওই বাড়িতেই ঘুমোতে হবে। নমিতা বলল, আমি যাব না। লতা বলে, চলো দিদি, ওকে বরঞ্চ পুকুরপাড়ে শুইয়ে দিয়ে যাই, আজ গ্রামে অনেক লোকজন, তাই ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

নমিতা অগত্যা আমাদের সঙ্গে ঘুমোতে গেলো। রাত্রি ১টা নাগাদ প্রচণ্ড চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেলো। আমি নমিতাকে ধাক্কা দিয়ে বললাম, চল উঠে দেখি, মনে হয় ডাকাত পড়েছে। উঠে দেখা তো দূরের কথা, নমিতা গায়ের চাদরটাকে ভালো করে মাথায় ঢেকে ঘুমিয়ে পড়ল, মানে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে শুয়ে রইল। আমি আর লতা দোতলার রেলিং থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে? সবাই বলছে ডাকাত! ডাকাত! লতা আর আমি নমিতার চাদর টেনে খুলে দিয়ে বললাম, ওরে ওঠ, সবাই বলছে ডাকাত পড়েছে। নমিতা বলল, আমি মরে গেছি, ডাকাত আসলে নিশ্বাস ফেলব না। অগত্যা নমিতাকে ছাড়াই আমি আর লতা নিচে নেমে এলাম। দেখি গ্রামের সবাই হ্যারিকেন হাতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। কারণ ঘটনাটা ততক্ষণে জানা গেছে, সে সেই সময় নকশাল আন্দোলনকারীরা স্কুল বাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আগুন নেভাতে গ্রামের সবাই তৎপর হয়ে উঠল আর আমরা আন্দোলনকারীদের হাত থেকে গ্রামের একমাত্র স্কুলকে বাঁচানোর জন্য গ্রামের লোকেদের আন্তরিক প্রচেষ্টার সাক্ষী হয়ে রইলাম। সেই রাত্রে আর ঘুম হলো না। পরের দিন ভোরের ট্রেনে আমাকে ফিরে আসতে হবে। আমি যখন ট্রেনে উঠলাম, নমিতা তখন গভীর ঘুমে তাই নমিতার সঙ্গে আর দেখা হলো না।

ছোটমাসির বিয়েতে নমিতার সঙ্গে শেষ দেখা। এর বছরখানেক পর নমিতার বিয়ে হয়েছিল। বাবা অসুস্থ থাকায় আমরা কেউ-ই যেতে পারিনি। বিয়ে ঠিকমতো হলেও বিয়ের পর থেকেই নমিতাকে অনেক টাকা নিয়ে আসবার জন্য ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা চাপ দিত। ও একটু সোজা সরল, গোবেচারা স্বভাবের ছিল বলে শ্বশুরবাড়ির সব অত্যাচারই মুখ বুজে সহ্য করতো। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সমস্ত কাজ করার পরেও শ্বশুরবাড়ির সীমাহীন অত্যাচারের কথা সে তার বাবা-মা-কে পর্যন্ত জানাতো না, পাছে অশান্তি হয়। এদিকে নমিতার শ্বশুর-শ্বাশুড়ি ছেলের বিয়ে অন্য কোনো বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে দেবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু নমিতা বেঁচে থাকাকালীন তো ছেলের বিয়ে অন্যত্র দেওয়া যাবে না। নমিতার ওপর শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার তখন চরম পর্যায়ের পৌঁছেছে। হঠাৎ একদিন মায়ের কাছে খবর আসে নমিতা সাপের কামড়ে মারা গেছে। গ্রামের দিকে সাপের

খুব উৎপাত। তাই প্রথমে খবরটা সবাই বিশ্বাস করলেও পরে ঘটনাটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

শ্বশুরবাড়ির সীমাহীন অত্যাচারও যখন তাকে দমাতে করতে পারেনি, তখন একদিন তাকে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়। বিষক্রিয়ায় যখন তার শরীরটা নীল হয়ে তার প্রাণটা বেরিয়ে যায়, তখন সে সাপের কামড়ে মারা গেছে বলে রটিয়ে দেওয়া হয়।

যে নমিতাকে আমরা বোকা বলে ভাবতাম, কখনো তার সরলতার সুযোগ নিয়ে ক্ষ্যাপাতাম, সে তার কষ্টের কথা, অত্যাচারের কাহিনী কাউকে না জানিয়ে আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে, এ সমাজের নিষ্ঠুর দংশন থেকে আমাদের সবার কাছ থেকে নীরবে বিদায় নিল। আমরা নমিতার মৃত্যুর খবর পেলাম অনেকদিন পর। বাবা অসুস্থ থাকায় নমিতার বাড়ির লোকেরা আমাদের খবর দিতে চায়নি। তাই যে নমিতাকে একদিন পাছে অসতর্ক কোনো কথা বলে ফেলে, সহজ-সরল স্বভাববশত কিছু করে বসে বলে পাহারা দিতে হতো, সেই নমিতাই জীবনযুদ্ধে নিজের অধিকারের এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে চায়নি। সকলের আগোচরে পণপ্রথার বলি হয়ে হয়ে নিজের জীবনকেই তিলে-তিলে নিঃশেষ করেছে।

জীবনসংগ্রামে ছলনা ও নিষ্ঠুরতার কাছে সে পরাজিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু জীবনের অস্থির অবস্থায় বাস্তবের কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের অধিকারের জন্য নমিতা সে দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল তা আমাদের অন্তর আত্মাকে জাগ্রত করেছে।

অবসন্ন মুহূর্তে স্মৃতিগুলো ভিড় করে আসে। বারবার মনে পড়ে পুরনো দিনের কথা, আর সঙ্গে খেলার দিনগুলো কিন্তু নমিতা! হায় কোনোদিনই এ জীবনে আর তার সঙ্গে দেখা হবে না। সে এখন শুধুই স্মৃতি।

তাই আমার ছোট্টবেলার খেলার সাথী নমিতা—তার উদ্দেশেই উৎসর্গ করলাম—উৎসর্গ।

আলোচনা

আড্ডা মারতে অনেকেই ভালোবাসে। আর আড্ডা মারতে একবার শুরু করলে ঘড়ির কাঁটাটা কেমন যেন সাঁতারের স্রোতের মতো বয়ে যায়। আড্ডায় বিভিন্ন আলোচনা ঘিরে জমে ওঠে কখনো বা উল্লাস কখনো বা কোনো বিয়োগান্ত ঘটনা, কখনো বা কোনো সমালোচনা কখনো বা আলোচনা, অনেক সময় তপ্ত কফির কাপে উষ্ণতাকে আবার বড্ড বেশি বাড়িয়ে তাকে আবার গভীর আলোচনার প্রাঙ্গণে মন হয়ে যায় একাত্ম। এরকমই আলোচনার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে অনেক অজানা ঘটনা যা অভিজ্ঞতার ডালিতে অঞ্জলি কখনো কোনো শুভ্র প্রভাতে অথবা শুভ্র সন্ধ্যায়। স্মৃতির সরনীতে এক একটা ঘটনাপ্রবাহ এক একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রূপ নেয় প্রশস্ত সরনিতে।

রিমা এবং টিনা, দুজনেই কলেজে পড়ে একই ক্লাসের ছাত্রী। মাঝে মাঝে ক্লাস না থাকলে তারা প্রায়-প্রায়ই কলেজের মাঠে যেখানে অনেক মহীরুহ পাতা দিয়ে এক ছাতার বেষ্টনী তৈরি করে দিয়েছে, সেখানে বসে, নানারকম আলোচনা করবে বলে। জুতো খুলে বসতে বসতেই রিমা বলে, জানিস টিনা দিনে দিনে কেউ অতিমানব হয়ে যাচ্ছে আর কেউ কেউ সিনেমা দেখে ভাবে এগুলো সবই বাস্তব আর স্ট্যাটাস সিম্বল রক্ষা করতে গিয়ে কেউ কেউ পড়ছে পা পিছলে। কিন্তু আমরা একে অপরের থেকে কত দূরে আমরা অনেক সময় পরস্পরকে অন্তর দিয়ে বোঝবার চেষ্টাও করি না। বলতে পারিস লোভ সংবরণ করার কোনো ওষুধ আজ পর্যন্ত বেরিয়েছে কিনা? আমাদের মধ্যে সহজ-সরল অনুভূতিসম্পন্ন মহিলাও যেমন আছে তেমনি আবার কিছু স্ট্যাটাস রক্ষা করতে গিয়ে কেউ কেউ সমাজ জীবনে, পরিবারিক জীবনে নিয়ে

আসে এক করুণ উপাখ্যান। যা সারা জীবনের জন্য তাদের নিকট অশান্তির বীজ বপন করে।

টিনার তখন মনে পড়ে যায় অতি সাম্প্রতিক এক ঘটনা। তার চোখটা কেমন যেন ছলছল করে ওঠে। টিনা বলে, দেখ্ না আমার এক মাসির ছেলে, আমার থেকে বয়সে বেশ বড়, কিন্তু ছোটবেলা থেকে একই সঙ্গে বড় হয়েছি। খুব মেধাবী ছাত্র ছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষাতে সারা বাংলার মধ্যে দশম স্থান পেয়েছিল। গর্বে আমাদের বুক ভরে গিয়েছিল, জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় মেডিকেল বিভাগে প্রথম হয়ে সে মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তে ঢোকে। ডাক্তারি পরীক্ষাতেও খুব ভালো ফল করবার জন্য সে অনেক ভালো সুযোগ পায়। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। বিবেকানন্দ চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ তার আদর্শবোধ। তাই শহরের প্রাণহীন মেকী পয়সা রোজগারের আকর্ষণের থেকেও গ্রামের মুক্ত পরিবেশে গরিব মানুষগুলোর মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই যেন তার চিকিৎসা বিজ্ঞানের সার্থকতা।

নির্বাণ অর্থাৎ আমার মাসতুতো দাদা তাই ডাক্তারি পাস করে গ্রামে গিয়েই প্র্যাকটিশ শুরু করে। ছেলে বড় হয়েছে, গ্রামে গিয়ে ডাক্তারিতে বেশ পসার করেছে। এবার তো ছেলের বিয়ে দিতে হবে। আমার মাসি এবং মেসোমশাই যোগ্য পাত্রী দেখে শুভদিনে শুভক্ষণে মেয়েটির সঙ্গে আমার ভাইয়ের গাঁটছড়া বেঁধে দিল। বিয়ের সময় কনেকে যতটা লাজুক যতটা নরম বলে মনে হয়েছিল, বিয়ের ঠিক একসপ্তাহ পর থেকেই সে তার নিজস্ব স্বরূপ প্রকাশ করতে শুরু করে। ডাক্তারের বৌ হিসেবে কোথায় তার দামি দামি গাড়ি করে কলকাতার নামি মার্কেটে ঘুরে বেড়ানোর কথা। তার বদলে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে লোকাল ট্রেনে পুরুলিয়ার এই বান্দোয়ান গ্রামে আসাটা আর সে একদম পছন্দ হয়নি তা তার ব্যবহারেই ফুটে ওঠে। গ্রামে এসেই ডাক্তারবাবুর স্ত্রী তার স্বামীকে সমানে আর্থিক চাপ দিতে থাকে, যা একজন গ্রামের ডাক্তারের পক্ষে মেটানো সম্ভব নয়। ব্যস্, শুরু হয় অশান্তি। ডাক্তার-এর গৃহিণীর আধুনিক আসবাবপত্র চাই-ই, চাই। বেচারা ডাক্তার। গ্রামে যে যা পারে, পাঁচ টাকা, দশ টাকা, যে পারে না সে নিজের বাড়িতে যা ফসল হয়, সেই ফসল থেকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস আমার ডাক্তার ভাইকে দিয়ে যায়। আমার ভাই এ জীবনে অভ্যস্ত হলেও আর নববিবাহিত স্ত্রী এ জীবন কিছুতেই

মেনে নিতে পারছিল না। একদিন তাই সুস্মিতা অর্থাৎ আমার ভাইয়ের স্ত্রী, ভাইকে বলে, আমি এভাবে কষ্ট করে থাকতে পারছি না, তুমি আমাকে আমার বাবা-মার কাছে দিয়ে এসো।

নির্বাণ তার স্ত্রীকে বোঝায় যে, আজ আমার দু/তিনটে সিরিয়াস রোগী আছে। আমি তোমাকে ২/১ দিন বাদে ঠিক তোমাকে তোমার বাবার কাছে দিয়ে আসব। স্ত্রী কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাকে সেদিনই পুরুলিয়া থেকে কলকাতার বিধান নগরে অর্থাৎ সল্টলেক সিটিতে পৌঁছতে হবে। ডাক্তার তখন নিরুপায় হয়ে তার স্ত্রীকে বলে, ঠিক আছে, তুমি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নাও। আমি তোমাকে তোমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই চলে আসব, না হলে যারা আমার উপর ভরসা করে আছে তাদের কিছু হলে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। ডাক্তার গৃহিণী রাজি হয়ে যায়। কথামতো স্ত্রীকে পৌঁছে দিয়ে বলে, তুমি আমায় ভুল বুঝো না। যে দিনই তুমি ফিরে যেতে চাইবে, খবর দিলেই আমি এসেই নিয়ে যাবো। বউয়ের উত্তর, তুমি যাচ্ছো, যাও, যতদিন ওই অজপাড়া-গাঁ থেকে না আসছো, ততদিনই আমি এখানেই থাকব, একে মানসিক অবস্থা খারাপ, তারপর দুজন সিরিয়াস রোগী, নানারকম চিন্তা নিয়েই হাওড়া স্টেশনে এসে নির্বাণ ট্রেনে ওঠে। ট্রেনটাও সেদিন লেট করে পৌঁছয়। সামনেই বান্দোয়ান যাবার শেষ বাস। নানা চিন্তা নিয়েই বাসের প্রথম গেটের হাতল ধরে, পারেনি ধরতে। দ্বিতীয় গেটের হাতল ধরতে গিয়েই পা হড়কে একদম বাসের নিচে। বাসের পেছনে একটা লোহার পাতে জামা আটকে প্রায় আধ মাইল বাসটা তাকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। হঠাৎ গ্রামের রাস্তায় একজন রিকশা ভ্যানে করে যেতে যেতে দেখে ফেলে, সে এবং সাইকেল ভ্যানের সহযাত্রীদের চিৎকারে বাস থামায়। আমার ভাইকে মৃতপ্রায় অবস্থায় বের করে আনে। যে লোকটি সাইকেল ভ্যানের চালক, সে ভ্যানের তলা থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে এসে দেখে, যে তারা পেট ব্যথা থেকে শুরু করে যে কোনো কঠিন রোগে যার শরণাপন্ন হয়, সেই তাদের অত্যন্ত প্রিয়জন ডাক্তারবাবুই আজ মৃতপ্রায়। বাসের প্রায় প্রতিটি লোকই নেমে আসে। প্রায় সবাই তার রোগী। ডাক্তারবাবু তখন অজ্ঞান। তারাই ডাক্তারবাবুকে তুলে নিয়ে যায় একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন হাতুড়ে কম্পাউন্ডারের কাছে। কর্তব্য ও মানসিক চাপে সে রোগীদের চিকিৎসা করে তাদের সুস্থ করবে বলে

বাসে উঠতে গিয়েছিল আজ তারই জীবন সঙ্কটে। আচ্ছা বল তো এর কৈফিয়ত কে দেবে? বলতে বলতে টিনা হাউ-হাউ করে কাঁদতে থাকে।

রিমা, টিনাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, তোর ভাই নিশ্চয়ই ভালো হবে, অতগুলো গরিব মানুষের আশীর্বাদ তাকে সুস্থ করে তুলবেই। আমি তোকে আরেকটা ঘটনা বলি—আমাদের অত্যন্ত পরিচিত একজন ডাক্তার আছেন, যিনি অসম্ভব ভালো প্র্যাকটিস করেন এবং গরিব দুঃখীদের অনেক সময় একটু বাড়তি সুযোগও দিতেন এমনকি কখনো কখনো তাদের fees-ও নিতেন না। কিন্তু বাড়িতে ফিরলেই তো মহাবিপত্তি। তার স্ত্রীকে হিসেব দিতে হবে, দিনে সে কটা রোগী দেখেছে, কটা অপারেশন করেছে আর কত টাকা আয় করেছে। যদি আয়ের অঙ্কটা মোটা হয়, তাহলে তো ডাক্তার গৃহিণীর পৌষ মাস। মুখে হাসি আর ধরে না। টাকাটা সিন্দুকে ঢুকে যায়। পরের দিনই কোনো বড় সোনার দোকানে বা কোনো আসবাবপত্রের দোকানে বা কলকাতারই কোনো বড় জামা-কাপড়ের এয়ার কন্ডিশন লাগানো দোকানে তাকে জিনিসপত্র কিনতে দেখা যায়। আর যেদিন অঙ্কটা ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মনোমত না হয় তখন তিনি কোমল মূর্তি ছেড়ে সংহার মূর্তি ধরেন। সারাদিনের পরিশ্রান্ত ডাক্তারবাবুকে খাবারের বদলে মুখ ঝামটা খেতে হয় আর রাত্রে ঘুমোতে যাবার সময় ঈশ্বরের নাম শোনার পরিবর্তে বৌ-এর গালিগালাজ শুনতে শুনতে ঘুমোতে যেতে হয়। আর জানিস তো সিরিয়াস রোগী হলে. আপারেশনের পরে হঠাৎ কোনো জটিল সমস্যা দেখা দিলে শত চেষ্টা করলেও ডাক্তারবাবুকে খবর দিলে তার স্ত্রীর সুবাদে সেই খবর ডাক্তারবাবুর কান অবধি পৌঁছবে না। আচ্ছা বল তো টিনা, এই অবহেলার ফলে যদি কোন রোগী মারা যায়, তাহলে কে দায়ী হবে?

রিমা, টিনা খুব গভীরভাবে কলেজের মাঠে বসে আলোচনা করছে এমন সময় ওদের ক্লাসেরই আরেক বন্ধু অরিজিৎ এসে হাজির। অরিজিৎ হাসতে হাসতে বলে, কি রে তোরা দুই বন্ধু মিলে কি এত গভীর ভাবে আলোচনায় মত্ত? রিমা, টিনা যেন সংবিৎ ফিরে পায়। দুজনেই হেসে ফেলে। জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা অরিজিৎ, তুই কলেজ থেকে বেরিয়ে কি ডাক্তারি পড়বি উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আবার প্রশ্ন, আচ্ছা তুই যদি ডাক্তার হোস তাহলে তুই কি করবি? শুধু অর্থ উপার্জন করবি?

অরিজিৎ বলে, শোন, আমি যদি ডাক্তার হই, তাহলে সপ্তাহে একদিন বিনা ়য়সাতে গরিব মানুষের চিকিৎসা করব। বাকি দিনগুলো দেখা যাবে। আগে তা কলেজ থেকে বেরিয়ে ডাক্তারিতে ঢুকে পাশ করি তখন ভাবা যাবে। তবে ়খন কি হয় জানিস তো আমার ক্লাবের বন্ধুদের কাছ থেকে শোনা যে, এখন য সব নার্সিং হোম তৈরি হচ্ছে বা বড় বড় নার্সিংহোম শহরে যতগুলো আছে গারা কিভাবে ডাক্তার নেয় বল তো? তারা অর্থাৎ নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ প্রথমে ়কটা চুক্তি করে যে মাসে কতগুলো অপারেশন কেস দিতে হবে। অনেকসময় ়মনও হয় যে, যে সমস্ত কেসে অপারেশন না করলেও চলে, অপারেশন ফিজ ়বং চুক্তি দুই মেনে ওই কেসটা অপারেশন করতেই হবে। বুঝলি এটাই াস্তব, আর চুক্তি না মানলে তার কোনো মূল্যই নেই, পরের দিনই চুক্তি গঙার দায়ে ছাঁটাই। সুতরাং মানসিকতার দিকে থেকে চিকিৎসা ব্যবস্থা কি কম মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে দেখ। এসব শুনতেও খারাপ লাগে। আর ডাক্তার লেই তো স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেন করতে হবে। সেই স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেন করতে গলে নুন আনতে পান্তা ফুরোবে। সুতরাং চিকিৎসা ব্যবস্থার রমরমা, ভালো ়্যাট, ভালো গাড়ি, মাঝে মাঝেই ভালো মন্দ জায়গায় বিভিন্ন নামি দামি ার্টিতে সস্ত্রীক উপস্থিত থাকা আর নিজের পসার বাড়ানোর জন্য মাঝে াঝেই বিদেশে যাওয়া।

টিনা বলে ওঠে, না রে, সবাই তো সমান নয়। এরই মধ্যে অনেক ব্যতিক্রম াছে, যারা নিজেরা সর্বসুখ বিলিয়ে দেয় সেবার স্বার্থে। আমারই অতি পরিচিত একজন ডাক্তার আছেন, যাঁর স্ত্রীও কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। ভদ্রলোক জেনারেল মেডিসিনের-এর নামকরা আর ওনার স্ত্রী তো নাম করা সার্জন। কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যেও দুজনেই দুজনের ভাষা বোঝেন। তাই কোনো অশান্তির বালাই নেই। মানুষের জন্য অবারিত দ্বার। আর এ রকম এখনও কয়েকজন আছেন বলেই, সমাজটা টিকে আছে যারা আমাদের অজান্তেই অনুপ্রেরণা দিয়ে যান।

অরিজিৎও সম্মতি জানায়, বলে তা ঠিক আমি ডাক্তার হলে আগেই পরিবারের লোকজনের সঙ্গে চুক্তি করে নেবো যাতে আমার কাজে কেউই কোনো রকমভাবে হস্তক্ষেপ করতে না পারে।

রিমা বলে, অনেকক্ষণ হয়ে গেল। পেটে তো ছুঁচো ডন দিচ্ছে, চল ক্যান্টিন

থেকে অন্তত কিছু খেয়ে আসি। তারপর আবার না হয় এসে কিছুটা আলোচন করা যাবে। অরিজিৎ বলে, টিউশনির মাইনেটা এখনও এক পয়সাও খরচ হয়নি। চল, তোদের খাইয়েই খরচা শুরু করি। কিন্তু একটা শর্ত আছে। রিম আর টিনা দুজনেই জিজ্ঞাসা করে কি শর্ত?

অরিজিৎ বলে, ফিরে আসলে আলোচনার সূত্রপাত আমিই করব।

দুই বন্ধুই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। তিন বন্ধু কলেজের ক্যান্টিন থেবে খেয়ে এসে আবার আলোচনায় মত্ত হয়। অরিজিৎই শুরু করে। বলে, দেখ তোরা মেয়েরা কত সাজগোজ করিস। সাজার পেছনে দামি দামি জিনিসপত্র কিনে কত টাকা নষ্ট করিস।

রিমা আর টিনা একসঙ্গে জোরে প্রতিবাদ করে চেঁচিয়ে ওঠে, বলে মোটেই না।

অরিজিৎ বলে, মোটেই না! তবে শোন আমাদের এলাকার একটা ঘটন বলি, যার থেকে তোরা অনেক শিক্ষা নিতে পারবি, ভবিষ্যতে প্রয়োজনে মানসিকতারও পরিবর্তন করতে পারবি।

অরিজিৎ বলে চলে, জানিস তো! আমাদের পাড়ায় সুকোমল রায় একজন খুবই মেধাবী ছাত্র ছিল। তার কাছে ছেলে মেয়েদের পড়ানোর জন অভিভাবকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। সে প্রাইভেটে ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে ভালোই উপার্জন করতো। মা ও ছেলে ছাড়া সংসারে কেউই ছিল না। তাই ছেলের উপার্জিত অর্থে দুজনের ভালোই চলে যেতো। বেশ কয়েকবছর যাবার পর সুকোমল ব্যাঙ্কে অফিসার পদে পরীক্ষা দিয়ে চাকরিও পেলো। সকাল ১০টা থেকে ৫টা ব্যাঙ্কের চাকরি, ফিরে এসে সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী পড়ানো। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই মল্লিকা বলে সুন্দরী এক ছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষার জগতের বাইরেও একটা সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা আস্তে আস্তে ভালোবাসার বন্ধনে দুজনকেই বেঁধে ফেলে। এক শুভদিনের শুভলগ্নে চার হাতের মিলন হয়। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই মল্লিকা সুকোমলকে বিভিন্ন দামি জিনিসপত্রের অর্ডার দিতে শুরু করে। প্রথম প্রথম স্ত্রীর আব্দার শুনে তাকে খুশি রাখার জন্য সব জিনিস আনতে শুরু করলে একসময় তার জমানো পুঁজিতে হাত পড়ে।

সুকোমল তার স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করে বলে, মল্লিকা, আমি আস্তে

আস্তে তোমার সব চাহিদা পূরণ করে দেব, কিন্তু স্ত্রীর বায়না একই সঙ্গে ঘর সাজানোর জন্য বড় সাইজের রঙিন টি. ভি চাই, ফ্রিজ চাই, গৃহসজ্জার জন্য যা যা আধুনিক আসবাবপত্র, সবই চাই—যা অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ। প্রায়, লক্ষ টাকার প্রয়োজন। সুকোমল, মল্লিকাকে আপ্রাণ বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু স্ত্রীকে বোঝাতে না পেরে সুকোমলের মন খারাপ। এদিকে মল্লিকা এতই অবুঝ মুখ ভার করে মন খারাপ করে বসে থাকে। সুকোমল তার স্ত্রীকে এতই ভালোবাসে যে সে তার স্ত্রীর মলিন মুখ দেখতে চায় না, হাসিমুখই দেখতে চায়। তাই সে পড়েছে ঘোর সঙ্কটে। চিন্তার যেন শেষ নেই, কি হবে? দুশ্চিন্তার গাঢ় কালিমা তাকে রাতের পর রাত অনিদ্রার ঘোর অন্ধকারে ঠেলে দেয়। কিন্তু না, সুকোমল ভাবে, তার যা হয় হোক, এই অশান্তি আর ভালো লাগে না। মল্লিকার হাসিমুখ সে অনেকদিন দেখেনি। তাই স্ত্রীর হাসিমুখের জন্য সে ভাবেই হোক তাকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। সে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার, তাই সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনছে। হঠাৎই যেন সুযোগটা হাতে এসে যায়। একদিন একটা কোম্পানির পক্ষ থেকে ক্যাশে দু-লক্ষ টাকা জমা হয়। সুকোমল জীবনে সে কোনদিনই কোনো অন্যায় কাজ করেনি, সে শুধুমাত্র ঘরে হাসির জোয়ার আনার জন্য টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা না দিয়ে তার স্ত্রী বায়না মতো সব জিনিসই ঘরে আনল। ঘরে তখন হাসির সাজানো বাগানে বিকেল ভোরের ফুল ফুটেছে। আর সুকোমল—তার অন্তরটা বিবেকের দংশনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ মা এসে ছেলের ঘরে ঢোকে। সুকোমল ভাবে অনেক কষ্ট করে মা তাকে পড়াশুনা করিয়েছেন, প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যেও মা তাকে সাবধানে আগলে রেখেছেন, পাছে ছেলে কোনো অসৎ পথে যায়! সামনেই ঠাকুর পরমহংসদেবের একটা বড়ো ফটো। ঠাকুরই তো ভাবসমাধি অবস্থায় বলেছিলেন 'টাকা মাটি, মাটি টাকা।'

অতি আনন্দে মল্লিকা আজ গভীর ঘুমে। পাশের ঘরে মাও বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু সুকোমলের চোখে আজ এক অস্থির আত্মবেদনা। পরের দিনই সিদ্ধান্ত নেয়। সবই জানিয়ে দেবে স্ত্রীকে। মল্লিকাকে ডাকে, বলে তুমি যা চেয়েছ, আমি সবই এনে দিয়েছি। কিন্তু এত টাকা কোথায় পেলাম জানো? একটা কোম্পানির টাকা কেনো জমা না দিয়ে তোমার আবদার মতো সব এনে

দিয়েছি। মল্লিকা তো অবাক হয়ে যায়। কীভাবে পরিত্রাণ পাবে তারই আলোচনায় মত্ত। কিন্তু সময়ের ঘড়িটা তখন যেন ওদেরই বিদ্রূপ করে এগিয়ে গেছে অনেকদূর। হঠাৎ কলিং বেল বেজে ওঠে। দরজা খুলে দেখে পুলিশ অফিসার ওয়ারেন্ট নিয়েই তাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। সুকোমল পুলিশের ভ্যানে ওঠার আগে স্ত্রীকে বলছে, মল্লিকা একবার অন্তত হাস। এই হাসি মুখটাই জেলের ভেতরে ও আমাকে একদণ্ড শান্তি দেবে। তুমি ভালো থেক। মল্লিকার চোখে তখন বাঁধভাঙা জল। সুকোমলের দীর্ঘদিন কেস চলে। সে নিজেই তার সব দোষ স্বীকার করে নেয়। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই তার তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। পুলিশ এসে তার ঘরের জিনিসগুলো বাজেয়াপ্ত করে। ফলে সে সংসার একদিন বসন্ত কালের নতুন ফুলের মতো সুরভিত হতে পারত, সেই সংসারই শুধুমাত্র নির্বুদ্ধিতার জন্য শীতের ঝরা পাতার মতো শুকিয়ে গেল।

রিমা আর টিনা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এতক্ষণ অরিজিতের কথাগুলো শুনছিল, মল্লিকার নির্বুদ্ধিতা যেন রিমা টিনাকেও খুব নাড়া দেয়। তাদের মন খারাপ হয়ে যায়। অরিজিৎ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দুই বন্ধুকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য বলে, আরে এর মধ্যে ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। সবাই তো একই পথের পথিক নয়। এই ধরনের আলোচনা আমাদের সবাইকেই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করবে।

শোন তবে, তোদের আরেকটা ছোট্ট ঘটনা বলি, আমারই পরিচিত একটা পরিবার, দু ভাই আর মা। কোনো বোন নেই। বড় ভাই নিজের থেকেও ছোট ভাইকে বেশি ভালোবাসে। বড় ভাই বিয়ে করে। মার খুবই চিন্তা দাদার মতো বৌদিও ছোট ভাইকে ভালোবাসবে কি না? কিন্তু বৌদিও খুব ভালোবাসে তার একমাত্র দেওরটিকে। বৌদি নিজের ছোটভাইয়ের মতোই সবসময় আগলে রাখেন দেওরকে। বাইরে থেকে কেউ বুঝতেই পারবে না যে ওরা বৌদি আর দেওর। মনে হবে যেন বাড়ির বড় বোনের সঙ্গে ছোট ভাইয়ের গল্প। এই ভাবেই বিয়ের পাঁচ বছর ভালোভাবে কেটে যায়। কিন্তু হঠাৎই একদিন ছোট ভাই কলেজ থেকে ফেরে জ্বর গায়ে। দাদা তখন আফিসে। বৌদি-ই বাড়িতে ডাক্তার নিয়ে আসে। ডাক্তার দেখানো সত্ত্বেও কিছুতেই জ্বর কমছে না। বৌদির তো চিন্তার শেষ নেই। সে যে নিজের সন্তানের মতোই

তার দেওরকে ভালোবাসে। সে তার স্বামীকে অনুরোধ করে, যাও যেখান থেকে পারো, যত বড় ডাক্তার পারো তাকে একবার নিয়ে এসো। তার স্বামী তাকে বলে যা অর্থ আমার আছে তাতে হয়ত কোনো রকমে সরকারি হাসপাতালে ভাইকে রেখে চিকিৎসা চলতে পারে। জ্বর একদমই কমছে না। রক্ত পরীক্ষা ও অন্যান্য সমস্ত টেস্ট করে ডাক্তার রিপোর্ট দেয় যে ছোট ভাইয়ের দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে। বাড়িতে যেন দুঃখের কালো মেঘ সমস্ত সুখের পরিবেশটাকেই আস্তে আস্তে গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে ফেলে। বৌদি সব জানতে পারে তার স্বামীর কাছ থেকে। সে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে, তুমি তোমার একটা কিডনি ভাইকে দাও। আর তুমি যদি না দাও, তবে আমিই আমার একটা কিডনি দেব। যেখানে হোক যেভাবে হোক ছোট ভাইটাকে বাঁচাতে হবে। স্বামী তাকে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবে বলে আশ্বস্ত করে। কিন্তু ডাক্তার যে আর কোনো আশাই দিচ্ছেন না, সে কথা বড় ভাই হয়ে তাকেই বা কি করে বলবে, স্ত্রীকেই বা কি করে বোঝাবে! বৌদি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে তার ছোট দেওরের নিশ্চয়ই কঠিন কিছু হয়েছে, যা তার স্বামী তাকে গোপন করছেন। সে তার স্বামীকে বলে, তুমি টাকার জন্য ভেব না। টাকার জন্য যেন চিকিৎসা বন্ধ না হয়। বৌদি আসলে বাবা-মার একমাত্র সন্তান। তাই মেয়ের বিয়ের সময় বাবা মেয়েকে ভালোই গয়না দিয়েছেন। বৌদি আলমারিটা খুলে সোনার গয়নাগুলো একবার দেখে নেয়। ভাবে এগুলো বিক্রি করলে যে টাকাটা আসবে তাতে ছোটর চিকিৎসায় কাজে লাগবে। স্বামী একটু লাজুক। অনেক প্রয়োজনেও কোনোদিনই তাঁকে বিরক্ত করবে না।

পরের দিনই পরিচিত এক সোনার দোকানে গিয়ে সব গয়না বিক্রি করে প্রায় ৪০,০০০ টাকা পায়। বৌদি টাকাটা নিয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে। স্বামীর হাতে পুরো চল্লিশ হাজার টাকাটা তুলে দিয়ে বলে, পুরো টাকাটাই ছোটর চিকিৎসায় লাগিয়ে দাও ছোটকে সুস্থ করে তুলতেই হবে। কিন্তু জানিস তো অরিজিৎ এক নিঃশ্বাসে বলে, বৌদি যখন মেয়েদের সবচেয়ে প্রিয় অলঙ্কার বিক্রি করে ছোটকে সুস্থ করে তোলবার জন্য সমস্ত টাকাটা তার স্বামীর হাতে তুলে দিচ্ছে, ভাগ্যের পরিহাসে তখন এমারজেন্সি থেকে তার স্বামীর ডাক পড়ল। বড় ভাইয়ের সব আশঙ্কাকে সত্যি করে নিয়তি যেন বলে

গেল—এ ডাক জীবনের শেষ ডাক। বৌদির হাতে তারই দেয়া সমস্ত টাকাটা ফেরত দিয়ে তার স্বামী বলেন, তুমি টাকাটা নিয়ে বাড়ি যাও। বৌদি বায়না করে, আমি একবার অন্তত ছোটকে দেখে যাই। বড়ভাই কাঁদতে কাঁদতে বলেন, তুমি বাড়ি যাও, আমি ছোটকে সাজিয়ে নিয়ে আসছি। শোন, তুমি পুজোতে ওর জন্য যে জামা-প্যান্ট দিয়েছিলে তা বের করে রেখ। ছোটর প্রিয় পাওয়ার-এর জুতোটা যেন ওর পায়ে পরিয়ে দিতে ভুল না হয়। আর ঠাকুরঘর থেকে খানিকটা চন্দনবাটা সরিয়ে রেখ। ছোটকে সাজাতে হবে তো! বৌদি বুঝতে পারে তার অতি প্রিয় ছোট আর ইহজগতে নেই। সে তার স্বামীর কোলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তারপর তো শুধু কান্না, আর কান্না, আজও তাদের ছোট ফটোর মধ্যে দিয়েই তাদের দেখে হাসে কিন্তু ২০ বছরের অকালে ঝরে যাওয়া ছোটকে ভালো করে তোলবার জন্য আর বৌদির যে আকুতি, যে আন্তরিক প্রচেষ্টা তা মানবিকতার বৃক্ষকে সূর্যমুখী ফুলের মতোই প্রস্ফুটিত করেছে, বল এরকম নির্লোভ মা-বোনেরা আজও সমাজে আছে যারা তাদের ভালোবাসার প্লাবনে সবাইকে আপ্লুত করেছে।

সুতরাং আসা-যাওয়ার পথের মাঝে নানা কথার মধ্যে দিয়েই অনেক আলোচনা বেরিয়ে আসে, যে আলোচনার গতিপথ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যাবার জন্য মানবিকতার দরজায় কড়া নেড়ে মানুষের বিবেককে নাড়া দেয়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চল বাড়ির পথে পা বাড়াই, না হলে বাড়ির লোকেরা চিন্তায় চিন্তায় আবার আমাদের নিয়েই আলোচনায় বসবে। রিমা আর টিনা আলোচনায় এতই মত্ত ছিল, যে অরিজিৎ ঘড়ির কাঁটা দেখাতেই দুজনে উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি রওনা দেয়। রিমা অনুরোধ করে অরিজিৎ আমাকে আর টিনাকে একটু বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে দিবি। অরিজিৎও রাজি হয়ে যায়। বলে, ঠিক আছে চল, কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে আজকের মতোই আমাদের আলোচনা আবার আগামী দিন চলবে।